স্বয়ম্বরা

শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

.

প্রকাশক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব-সাহিত্য-কুটীর
২২।৫ বি. ঝামাপুকুর লেন. কলিকাতা

মূল্য ১৷৷০ টাকা

বৈশাখ—১৩৫২

প্রিণ্টার—মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ
নিউ ক্যালকাটা প্রেস
৯৩।৩।১, বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত অজয়কুমার ভট্টাচার্য্য

করকমলেষু—

বড়-দা,

আপনার কাছে ভ্রাতার স্নেহ ও বন্ধুর প্রীতি একসঙ্গে পাইয়াছি। সেই কথা মনে করিয়া আজ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি আপনার হস্তে অর্পণ করিলাম।

আরঙ্গাবাদ (গয়া)
২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ সাল

প্রণত—
শ্রীমাণিক ভট্টাচার্য্য

স্বয়ম্বরা

১

কিশোরগঞ্জের জমীদার সারদাশঙ্করকে প্রজা, আত্মীয়-বন্ধু সকলেই শ্রদ্ধার সহিত একটু ভয়ের চক্ষে দেখিত। তাঁহার চরিত্রের উদারতার জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার গাম্ভীর্য্য, স্বল্পভাষিতা ও দৃঢ়তার জন্য অনেকেই তাঁহার সঙ্গ পরিহার করিয়া চলিত।

দিনের আহারাদির পর সারদাশঙ্কর অন্দর ও বাহিরের মাঝামাঝি একটা ঘরে বসিয়া কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করেন। সেই সময়ে আত্মীয়-বন্ধুদের অভাব-অভিযোগ তিনি শোনেন; বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে বাহিরের কাহারও সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। বিশেষ প্রয়োজন থাকিলেও বাহিরের লোককে পূর্ব্বাহ্নে তাঁহার নিকট হইতে প্রবেশের অনুমতি লইতে হয়।

সারদাশঙ্কর তাঁহার বিশ্রাম-শয্যার উপর সোজা হইয়া বসিয়া আছেন। অদূরে বসিয়া তাঁহার জামাতা সত্যব্রত বৈষয়িক ২।১টি বিষয়ে তাঁহার অভিমত লইতেছে এবং সেই সব বিষয়ে তাহার নিজের কি মত ও কি করিতেছে তাহাও জ্ঞাপিত করিতেছে। সারদাশঙ্কর স্থির চিত্তে শুনিয়া যাইতেছেন ও দুই একটি বিষয়ে নিজের ভিন্নমত থাকিলে তাহা স্বল্পকথায় বলিতেছেন।

হঠাৎ তাঁহার একমাত্র পুত্র বিজয় সেখানে সবেগে আসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, বাবা, এর বিচার আজ আপনাকে করতে হবে; নইলে আমার এখানে এসে ছুটো দিন থাকাও অসম্ভব।

বিস্মিত ও ঈষৎ বিরক্ত হইয়া সারদাশঙ্কর বিজয়ের পানে চাহিয়া বলিলেন, কিসের বিচার বিজয়?

বিজয় বলিল, সত্যব্রত আমায় অপমান করেছে, আমি তার বিচার ও মীমাংসা প্রার্থনা করি।

সারদাশঙ্কর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, সত্যব্রত তোমার অপমান করেছে!

বিজয় তেমনি উত্তেজিতভাবে কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার দেওয়া অধিকারের অহঙ্কারে ও আমাকে মানুষ বলেই মনে করে না।

সারদাশঙ্কর জামাতার পানে চাহিয়া বলিলেন, এ-কথার ভিতরে কি কোন সত্য আছে, সত্যব্রত?

সত্যব্রত ধীরস্বরে বলিল, না একটুও নেই। বিজয় ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, নিশ্চয়ই আছে।

সত্যব্রত পুনরপি দৃঢ়স্বরে বলিল, না নাই।

বিজয় বলিল, তুমি নৃসিংহ ঘোষের কাছে আমাকে অপমান করনি? আমি জানতাম না যে তুমি সত্য বল্‌তে ভয় পাও।

সত্যব্রত একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, মানুষকে গাল দিলেই পৌরুষ হয় না, বিজয়। নৃসিংহ ঘোষের সম্বন্ধে যা উচিত—তাই আমি করেছি। তোমার ভয়ে আমি অন্যায় কিছু করিনি—এই আমার অপরাধ।

সারদাশঙ্কর ভাবেন নাই যে দু'জনের বাদানুবাদ এই ভাবে তাঁহারই সম্মুখে পড়িয়া যাইবে। তিনি একটু বিস্মিত ও রুষ্ট হইয়া বলিলেন, তোমরা নিজেরাই যদি গায়ের জোরে এটা মীমাংসা করবে

ভেবেছিলে, তাহলে আমার কাছে আসার কোন দরকারই ছিল না। সত্যব্রত, বিজয় কি বল্‌তে চায়—ওকে বল্‌তে দাও। তারপর তোমার বক্তব্যও আমি শুন্‌ব।

দুইজনেই চুপ করিল। সারদাশঙ্কর পুত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন, এবার তুমি একটু সরল ভাষায় কি হয়েছে বল।

বিজয় বলিল, নৃসিংহ ঘোষের স্পর্দ্ধা বড়ই বেশী হয়েছে, গেল-বছর মাছ ধরতে যাবার সময় তাকে ডেকেছিলাম সঙ্গে যাবার জন্য: তাতে সে উত্তর দেয়—এখন বেগারি দেবার সময় তার নয়।

সত্যব্রত বাধা দিয়া বলিল, কথাটার একটু সত্য গোপন হচ্ছে—

সারদাশঙ্কর একটু তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, তোমাকে এই মাত্র বল্‌লাম না, বিজয় কি বল্‌তে চায় বিজয়কে বল্‌তে দাও, তারপর তোমার সময় এলে যথাসাধ্য বোলো।

সত্যব্রত একটু অপদস্থ হইয়া চুপ করিল।

বিজয় একটু খুসী হইয়া বলিতে লাগিল—আমি সেবারই তাকে বলেছিলাম, তোমার অহঙ্কার হয়েছে এই বিলের জমা নিয়ে। আস্‌ছে-বার তুমি এ-বিল পাবে না। তার বেলায় নবাব-পুত্রের উত্তর হ'ল—'সে আপনাদের অনুগ্রহ'।

সারদাশঙ্কর বলিলেন, বেশ বলে যাও—একটু শীঘ্র শেষ কর।

বিজয় বলিল, এত সত্ত্বেও, এবারেও সত্যব্রত সেই নৃসিংহকেই বিল জমা দিলে। আমি বল্লাম তা কিছুতেই দেওয়া হবে না। সত্যব্রত বল্‌লে—আমি একে দিয়ে ফেলেছি, আর উপায় নেই। আপনি সত্যব্রতের হাতে জমীদারীর কতকটা ভার দিয়েছেন স্বীকার করি; কিন্তু তার সঙ্গে কি আমাদের অপমান করবার ক্ষমতাও দিয়েছিলেন? ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য।

সারদাশঙ্কর সত্যব্রতের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এবার তোমার বক্তব্য বল।

সত্যব্রত বলিল, আমার বক্তব্য অতি সামান্য, আর তা সংক্ষেপেই শেষ করছি। নৃসিংহ ঘোষকে যখন ডাকা হয়, তখন প্রথমে সে বলে, তার ছোট ছেলের বড় অসুখ, এখন সে কি করে যাবে? তাতে বিজয় বলে, জমীদারের জমী রাখতে গেলে একটু-আধটু বেগারি দিতে হয়। নৃসিংহ বলে, অন্য সময় যা আদেশ করবেন তাই আমি করব, এখন যে সে সময় আমার নয়। আমার মতে নৃসিংহ ঘোষের সত্যকার কোন দোষ ছিল না। তার উপর নৃসিংহ সৎলোক, কোন-রকম প্রবঞ্চনার দিকে যায় না; উপরন্তু জমার বিল বলে ছোটখাট যা মাছ পাওয়া যায় তাই ধরে বিল উজোড় করার অভ্যাস নেই; ঠিক নিজের সম্পত্তি হলে মানুষ যেমন সাবধানে ব্যবহার করে, নৃসিংহ তাই করে। এই সব কারণে তাহাকেই আমি দে'ব বলেছিলাম এবং টাকা জমা দিলেই তাকে লেখাপড়া করে দিয়েছিলাম।

সারদাশঙ্কর। কিন্তু একটা কথা সত্যব্রত, Recommeudation বলে একটা জিনিষ আছে মানো? Prestige বলেও একটা কিছু আছে জানো বোধ হয়?

সত্যব্রত জিজ্ঞাসুভাবে সারদাশঙ্করের পানে চাহিয়া রহিল।

সারদাশঙ্কর বলিলেন, তা যদি জানো ও মানো, বিজয় যখন অমন করে নৃসিংহের সামনে বল্লে যে ওকে দিও না, তখন ওর মানটা তোমার রাখা উচিত ছিল।

সত্যব্রত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, কিন্তু তার আগে আমি যে ওকে কথা দিয়েছিলাম, আর বিজয় যে এক বছরের আগের কথা মনে করে বসে আছে তা আমি ভাবিনি। যতগুলি জমার খরীদদার ছিল তাদের

মধ্যে নৃসিংহই সব চেয়ে বিশ্বাসী ও সৎ, সে জন্য তাকে দেওয়াই আমার উচিত মনে হয়েছিল।

সারদাশঙ্কর। কিন্তু বিজয়কে অপমান করাও তোমার ঠিক কর্ত্তব্য না, যখন ওই একদিন জমিদারীর মালিক:হবে।

সত্যব্রত। আমি তো বিজয়কে ইচ্ছে করে কোন অপমান করিনি, যদি বিজয়েরই আমি কর্ম্মচারী হতাম, তবু আমি এই রকমই করতাম।

বিজয়। তাহলে আর বেশীদিন তোমাকে আমার কর্ম্মচারী থাকতে হ'ত না। তখন কি করতে ?

সত্যব্রত। তাহলেও যা করা উচিত মনে করতাম তাই করতাম, চাকরির ভয়ে অন্যায় করতাম না।

বিজয়। ভাগ্যে জমীদারের জামাই হয়েছিলে তাই এ গর্ব্বটা করতে পারলে। জান যে, কাজ কর আর না কর, মাসোহারাটা কোনখানে যাবে না।

সত্যব্রত। একথা বলা তোমার অন্যায়, কারণ একথা মিথ্যা! মাসোহারা বন্ধ হলেও আমি এ করতে কুন্ঠিত হতাম না।

বিজয়। যাক্, তোমার কাছে আমি এর জন্য আবেদন করতে আসিনি। আমি এসেছি বাবার কাছে তোমার যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে নালিশ করতে। তিনি যা বলবেন তাই হবে।

সত্যব্রত। বাবার আদেশ ছিল বলেই নিজের জ্ঞান মত ব্যবস্থা করেছি। বাবাই বলুন কি হবে।

সারদা। দেখ সত্যব্রত, সব জিনিষ নিক্তির তৌলে ওজন ক'রে হয় না। সংসার নিক্তির জায়গা নয়। তোমার কর্ত্তব্য দেখতে হবে, ছেলেদের মানও তোমাকে রাখ্তে হবে; বিজয়ের সত্যই অপমান জ্ঞান হয়েছে তা বুঝতেই পাচ্চ। এবার তুমি বলে দাও যে বিল কাহাকেও দেওয়া হবে না—বিল এবার খাসেই থাক্বে।

সত্যব্রত। তাহলে আমার কথা—আমার মান কোথায় থাকবে, বলুন? আমাকে যে আপনি কাজের সম্পূর্ণ ভার ও দায়িত্ব দিয়েছিলেন, সে-ভার ও দায়িত্বেরও তো কোন মর্য্যাদা তাহলে থাকে না।

সারদাশঙ্কর প্রতিবাদ মোটেই সহিতে পারিতেন না। তিনি গম্ভীর মুখে ও গম্ভীর স্বরে বলিলেন, যে লোক ভার তোমাকে দিয়েছে, তার আদেশের মর্য্যাদা রাখলে তোমার বোধ হয় বেশী অমর্য্যাদা হবে না। আমি আদেশ দু'বার দিই না, তুমি জান। এ আদেশও দু'বার দেব না জেনে রাখ। আমাকে, আশা করি, তোমার আদেশে চল্‌তে হবে না।

সত্যব্রত। আপনার আদেশেই আমি এতদিন কোন কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করে এসেছি। আপনি যখন সে কর্ত্তৃত্বভার নিয়ে নিচ্ছেন, আমি ছেড়ে দিতে বাধ্য। আমি কার্য্য ও দায়িত্ব-ভার আজ থেকে ছেড়ে দিলাম। নৃসিংহকে আমি যা বলেছি তা ফিরিয়ে নিতে পারব না। আপনার ইচ্ছা মত বিজয় সে কাজ ইচ্ছে হয় করতে পারেন। আমি আজ থেকে এর মধ্যে নেই।

সারদাশঙ্কর এতখানির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁহার মুখের উপর এতখানি তেজের কথা তাঁহার ছেলেরাও কোনদিন বলিতে সাহস করে নাই। তিনি আপনাকে আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, বিজয় মিথ্যা বলেনি, সত্যই তোমার অত্যন্ত স্পর্দ্ধা হয়েছে। নিজের অবস্থা তুমি একেবারে ভুলে গেছ। এখন যদি তোমাকে আমি নিজের উপায় নিজে দেখ্‌তে বলি—কি অবস্থা হয় তোমার?

সত্যব্রত। হয় ত খুব কষ্ট হবে প্রথমটা, কিন্তু শেষটা আমি ব্যবস্থা করে নিতে পারব।

সারদা। বটে! এত স্পর্দ্ধা তোমার! এত অকৃতজ্ঞ তুমি! নিজে ব্যবস্থা করবে? স্ত্রী-পুত্রের কি করবে?

সত্য। অনুমতি দিলে এবং আপনার কন্যার অমত না হলে, সঙ্গে নিয়ে যাব।

সারদা। খাওয়াতে পারবে?

সত্য। চেষ্টা করব: অবশ্য আপনার মেয়ের উপযুক্ত হবে না; কিন্তু গরীবের স্ত্রীর উপযুক্ত হতে পারে।

সারদা। আচ্ছা। বেশ, যাও; দেখে এস একবার বাইরে গিয়ে কত ধানে কত চাল হয়। আর যতদিন আমার মেয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে না পার, ততদিন তাদের নিয়ে যাওয়ার কথা মুখে এনো না। তবে তুমি স্বাধীন, যা খুসী করতে পার।

সত্যব্রত তৎক্ষণাৎ নীরবে সে স্থান ত্যাগ করিল। সে দেখিতে পায় নাই যে, তাহাদের বচসায় আকৃষ্টা হইয়া উমা পাশের ঘরের দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া গভীর বিস্ময় ও উৎকণ্ঠার সহিত দাঁড়াইয়া ছিল।

সারদাশঙ্করের দৃষ্টি হঠাৎ সেই দিকে পড়িল, তিনি কন্যার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন। স্বামীকে দেখিয়া তাহার মুখে যে অবগুণ্ঠন তুলিয়া দিয়াছিল তাহা খুলিয়া ফেলিয়া উমা পাষাণ-প্রতিমার মত মাঝখানের দুয়ারের একটা কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে!

কিশোরগঞ্জের জমীদার সারদাশঙ্কর তখন পঁয়ত্রিশ বৎসরের যুবক। সারদাশঙ্করের বিধবা মাতা ভুবনমোহিনী তখনও জীবিতা এবং তাঁহারই কথায় সংসার তো দূরের কথা সারদাশঙ্করের বিশাল জমীদারীটাই চলিত। তিনি যাহা বলিতেন তাহার উপর 'না' বলিবার কাহারও ক্ষমতা ছিল না, স্বয়ং প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার সারদাশঙ্করেরও ছিল না। সারদাশঙ্করের স্বভাবে যে একটা অসামান্য দৃঢ়তা ছিল, তাহা তিনি মায়ের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন।

একদিন দ্বিপ্রহরে ভুবনমোহিনী হঠাৎ পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পুত্র আসিলে মা বলিলেন, সারদা, আমার বড় সাধ, উমার বিয়ে দিয়ে নাতজামাই নিয়ে আনন্দ করি।

সারদাশঙ্কর ক্ষণমাত্র ভাবিয়া বলিলেন, তোমার ইচ্ছা হ'য়ে থাকে উমার বিয়ে দেবে, আমি আর তাতে কি বলব?

ভুবনমোহিনী বলিলেন, তোর মনে হতে পারে মেয়ে মোটে ন' বছরের, এরি মধ্যে বিয়ে! কিন্তু আমার বড় সাধ হয়েছে।

সারদাশঙ্কর বলিলেন, তোমার সাধ মেটাও মা,—আমি তো অমত করছি না। বল আমি আজ থেকে সম্বন্ধ দেখতে থাকি।

ভুবনমোহিনী বলিলেন, কিন্তু বাবা, এ বিবাহ আমি সাধারণ ভাবে হ'তে দেব না। উমা স্বয়ম্বরা হবে।

সারদাশঙ্কর বিস্মিত হইয়া মায়ের পানে চাহিয়া বলিলেন, স্বয়ম্বরা হবে—বল কি মা? আজকাল তো স্বয়ম্বরা-প্রথার তেমন চলন নেই।

ভুবনমোহিনী বলিলেন, চলন করতে বাধা নেই। কি করতে হবে না হবে, আমি তা বেশ করে ভেবে রেখেছি। তোকে বলছি তুই সেই মত কাজ করে যা। তার মধ্যেই আমি সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেল্‌ব।

সারদাশঙ্করের বিস্ময় তখনও কমে নাই। বলিলেন, তা উমা রাজী হবে মা?

ভুবনমোহিনী বলিলেন, সে ভার আমার বাবা। তোর কি আজ আমার কথার উপর অবিশ্বাস আসছে?

সারদাশঙ্কর ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, না মা, তা হয়নি। একটু বেশী আশ্চর্য্য হয়েছিলাম তাই এ-কথাটা ব'লেছি। বল কি কর্‌তে হবে, তাই করব।

ভুবনমোহিনী তখন বলিলেন, আজই একবার বড় স্কুলে যাও। হেড্‌মাষ্টার মহাশয়কে বলে এস কাল রবিবারে স্কুলের সব ছেলেরা এখানে খাবে। মাষ্টারদের সব নিমন্ত্রণ করবে। তারপর যা কিছু কর্‌বার আমি কর্‌ব। নিমন্ত্রিত ছেলেদের মধ্যে থেকেই তোর জামাইয়ের নির্ব্বাচন হয়ে যাবে।

সেইদিনই সারদাশঙ্কর স্কুলে গিয়া ছেলেদের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। এই নিমন্ত্রণ-ব্যাপার জমীদার-বাড়ীর পক্ষে একেবারে নূতন নহে। দুর্গাপূজা ও চৈত্রসংক্রান্তি এই দুই সময়ে জমীদার-বাড়ীতে ছাত্র-শিক্ষক সকলেরই নিমন্ত্রণ হইত। তখন ফাল্গুন মাস, হেড্‌মাষ্টার বলিলেন, এটা আবার বেশীর ভাগ হল।

সারদাশঙ্কর সংক্ষেপে বলিলেন, মায়ের ইচ্ছা তাই।

পরদিন আহারাদির ব্যবস্থা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইল। প্রকাণ্ড চক্‌মিলান বাড়ী। অসংখ্য ঘর। এক এক ঘরে এক এক জাতির ছাত্রেরা আহারে বসিল। প্রকাণ্ড পূজার দালানে ব্রাহ্মণ-ছাত্রেরা বসিল। পাশে চিক ফেলা রহিল। উমাকে লইয়া ভুবনমোহিনী সেখানে আসিয়া বসিলেন।

ভুবনমোহিনী উমাকে কোলের কাছে টানিয়া বলিলেন, বল দিকি দিদি, এতগুলি ছেলের মধ্যে কোন্ ছেলেটি সবচেয়ে ভাল?

উমা বেশ সাবধানতার সঙ্গে সকল ছেলেকে দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ দেখিয়া প্রথম সারির সব শেষে যে ছেলেটি বসিয়া ছিল তাহাকে দেখাইয়া দিল।

ছেলেটির বয়স আন্দাজ ১৪ হইবে। একহারা—ছিপ্ ছিপে গড়ন। গৌরবর্ণ, মাথায় কুঞ্চিত কেশ মাঝারি ছাঁটা। মুখখানি যেন ভাস্কর অতি যত্নে গড়িয়াছে; নাসিকা সুগঠিত, চক্ষুদুটি যেন দুটি নীলোৎপল··· তীক্ষ বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। বেশ অতি সাধারণ, পরনে সরু লালপাড় একখানি ধুতি, গায়ে একখানি উড়ানি জড়ানো তাও ধব্‌ধবে ফরসা নয়, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মনে হয় সাবান দিয়া কাচা।

ভুবনমোহিনী বেশ লক্ষ্য করিয়া ছেলেটিকে দেখিলেন। পরে উমার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, তোর পছন্দ আছে দিদি, ওকে বিয়ে করবি?

উমা, 'যাও ঠাকুরমা, তুমি বড় দুষ্টু' না বলিয়া গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

ভুবনমোহিনী পৌত্রীকে ছুটি দিয়া পুত্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পুত্র আসিলে, সেই ছেলেটিকে দেখাইয়া বলিলেন, এই ছেলেটিকে চিনে রাখ। আজই ছেলেটির নাম পরিচয় জানা চাই। এমন ভাবে সব কাজ করবে, যাহাতে কাহারও মনে কোন প্রকার সন্দেহ না হয়।

সারদাশঙ্কর বলিলেন, হঠাৎ ঐ ছেলেটির নাম জিজ্ঞাসা করলে একটু সন্দেহ তো হতেই পারে মা।

ভুবনমোহিনী বলিলেন, এই ঘরে সব ছেলেগুলিকেই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ছাত্রদের দক্ষিণা দিবার ব্যবস্থা কর; বল, আমার ইচ্ছা। তোমার কাছে এক এক করে সবাই যাবে, সবাইকে নিজ হাতে দক্ষিণা দানটা দেবে, অল্প-স্বল্প পরিচয়ও জিজ্ঞাসা করবে। ঐ ছেলেটির পরিচয় একটু বেশী করে নেবে।

সারদাশঙ্কর হাসিয়া বলিলেন, মা, তোমার বুদ্ধির কাছে চিরদিন আমার হার।

ভুবনমোহিনী বলিলেন, তা হবে না কেন? তুই যে আমারই পেটে জন্মেছিস্ বাবা।

সারদাশঙ্কর উঠিয়া মায়ের পরামর্শ মত দক্ষিণাদির ব্যবস্থা করিতে গেলেন। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, মা, পরিচয় জেনেছি। ঘর আমাদের ঠিক পাল্‌টা। বংশ খুব উচ্চ। খুব বুদ্ধিমান্ ছেলে, কিন্তু বড় গরীব। সম্পত্তির মধ্যে একখানি মাত্র মেটে ঘর ও বিঘে দুই জমি, অভিভাবিকা পিতামহী, আর কেউ নেই। নাম সত্যব্রত।

ভুবনমোহিনী প্রফুল্লমনে বলিলেন, একেই বলে ভবিতব্যতা। নইলে ঠিক পাল্টা ঘর হয়! তা উমার যোগ্য পাত্র। দেখো এরই সঙ্গে উমার বিবাহ হবে। এখন কি করতে হবে, কাল তোমাকে বল্‌ব।

সারদাশঙ্কর স্কুল-কমিটির প্রেসিডেণ্ট। পরদিন তিনি স্বয়ং স্কুলে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হেড্ মাষ্টার তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। হেড্ মাষ্টারকে তিনি বলিলেন,—প্রথম শ্রেণীর দুইটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্রকে তিনি প্রত্যেক দুই বৎসরের জন্য যথাক্রমে ১৫৲ ও ১০৲ টাকা করিয়া দুটি Scholarship দিবেন।

হেড্‌মাষ্টার প্রেসিডেণ্টকে প্রচুর ধন্যবাদ দিলেন। সেদিন প্রেসিডেণ্ট চলিয়া আসিলেন।

ছয়মাস পরে সত্যব্রত ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষা দিয়া বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হইল। হেড্‌মাষ্টার পরামর্শ দিলেন, তোমাকে পড়িতেই হইবে। সে গিয়া তখনকার মেট্রোপলিটান কলেজে ভর্ত্তি হইল। তখন মাসিক ৩০৲।৩৫৲ টাকা ব্যয় করিয়া কলেজ-হোষ্টেলে থাকিতেই হইবে এমন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না—স্কুলের Scholarship ও গভর্ণমেণ্টের ২০৲ টাকা Scholarship লইয়া তাহার নিজের খরচ ও পিতামহীর খরচ সব বেশ চলিয়া যাইতে লাগিল। বৃত্তিভোগী ছাত্র বলিয়া তাহার বেতন লাগিত না। একটা মেসে থাকিয়া সত্যব্রত পড়িতে লাগিল। সহরে আসিয়াও তাহার চালচলনের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না, সেই ধুতি ও উড়ানি বজায় রহিল। বাড়িল একজোড়া তালতলার চটি, আর সাবান দিয়া কাপড় কাচিয়া লওয়ার পরিবর্ত্তে ধোপায় কাপড় কাচিতে লাগিল।

এদিকে একদিন জমিদারের পাল্কি দরিদ্রের দুয়ারে লাগিল। ভুবনমোহিনী নামিয়া সত্যব্রতের পিতামহীর কাছে আসিয়া আপনার পরিচয় দিয়া বিবাহের মত চাহিলেন। এ কথাও বলিলেন, পৌত্রকে ঘর-জামাই রাখা হইবে না। জামাইয়ের জন্য পৃথক্ বাড়ী, পৃথক্ সম্পত্তি—সমস্ত ব্যবস্থা হ[illegible]। তিনি কেবল এই বাড়ী ছাড়িয়া নূতন বাড়ীতে যাইবেন মাত্র। বিবাহে যে ভূ-সম্পত্তি যৌতুক দেওয়া হইবে, তাহাতে তাঁহার পৌত্রের কোন দুঃখ রহিবে না।

পিতামহী যেন হাতে চাঁদ পাইলেন! তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তাঁহার নিজের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, বড় দুঃখ সহিয়া যে পৌত্রটিকে

অতিকষ্টে মানুষ করিয়াছেন, সে যে আশাতীত সৌভাগ্য লাভ করিবে, ইহাতে তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না।

ভুবনমোহিনী ইহাও বলিলেন যে, বধূমাতা তাঁহার পৌত্রের অযোগ্য হইবে না। তাঁহাকে একবার নাতবৌ দেখাইয়া আনিতেও চাহিলেন।

পিতামহী বিচার করিয়া বলিলেন, কোন প্রয়োজন নাই। আপনার পৌত্রী যে সুন্দরী, আপনাকে দেখিয়াই তাহা বুঝিয়াছি।

ভুবনমোহিনী বিবাহের দিন ইত্যাদি স্থির করিয়া চলিয়া গেলেন। সত্যব্রতকে আনানো হইল। তারপর নির্দ্দিষ্ট দিনে বিবাহ হইল। সারদাশঙ্করের একমাত্র পুত্র বিজয়ও এই বিবাহের কিছু পূর্ব্বে সেইবার ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করিয়া উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতায় গিয়াছিল।

বিবাহের পর সারদাশঙ্কর সত্যব্রতকে বুঝাইয়া বলিলেন, বাবা, যেমন বিজয় তেমনি তুমিও আমার পুত্র। আমার মায়ের ইচ্ছামত তোমাদের নামে যে সম্পত্তি দেওয়া হইল, তাহাতে তোমায় কখনও চাকুরী করিতে হইবে না। কিন্তু আমি চাই যে, সম্পত্তির কথা তুমি ভুলিয়া যাইয়া একমনে বিদ্যা অর্জ্জন করিবে। তোমার যে বিদ্যাবুদ্ধি, তাহাতে তুমি প্রভূত বিত্ত উপার্জ্জন করিতে পারিবে। কলিকাতায় আমার বাড়ী আছে, কর্ম্মচারী আছে; সেখানে থাকিয়া তুমি ও বিজয় মন দিয়া লেখা-পড়া কর—ইহাই আমার ইচ্ছা।

সত্যব্রত সব শুনিয়া ধীরভাবে জানাইল, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। তবে আপনার অনুমতি হইলে আমি যেমন ভাবে যেখানে থাকিয়া পড়িতেছি, তাহা করিতে পারিলেই সুখী হইব। সেখানে আমার কোন অসুবিধা হইতেছে না এবং আমি বিশেষ মন দিয়া পড়িতেছি।

সারদাশঙ্কর এ-কথায় বড়ই প্রীত হইলেন। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন কলিকাতার বাড়ীতে থেকে পড়তে তোমার আপত্তি কি?

সত্যব্রত উত্তর দিল, আমি যেখানে আছি, সেখানে আমি সর্ব্বক্ষণ আপনাকে বিদ্যার্থী বলিয়া অনুভব করিতেছি। ঐশ্বর্য্যের মাঝে থাকিলে তাহা ভুলিয়া যাইতে পারি, এবং বিদ্যার্জ্জনে শৈথিল্য আসিতে পারে।

সারদাশঙ্কর তাহাতে মত দিয়া বলিলেন, ছাত্র-হিসাবে তোমার বৃত্তির উপর পুত্র-হিসাবে আমি তোমাকে আর একটা পৃথক্ বৃত্তি দিব, তাহা লইতে তুমি সঙ্কোচ করিও না।

সত্যব্রত সবিনয়ে বলিল, আমি ছাত্র-হিসাবে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ও স্কুল হইতে আপনার দেওয়া যে বৃত্তি পাই, তাহাই আমার ও আমার ঠাকুরমার পক্ষে যথেষ্ট। যদি প্রয়োজন হয়, আমি আপনার নিকট হইতে চাহিয়া লইব।

সারদাশঙ্কর সন্তুষ্টচিত্তে তাহাতেও সম্মত হইলেন। পিতামহী আসিয়া কিশোরগঞ্জের নূতন বাড়ীতে উঠিলেন। সারদাশঙ্করের বাড়ীর সংলগ্নেই সে বাড়ী। উমা আসিয়া কোন কোন দিন তাঁহার কাছে থাকিতে লাগিল। পিতামহীর কোন ক্ষোভ রহিল না।

সত্যব্রত পড়িতে চলিয়া গেল। সত্যব্রত প্রশংসার সহিত বৃত্তিসহ এফ্-এ পাশ করিল। বিজয় এফ্-এ পাশ করিতেই ভুবনমোহিনীর অনুরোধে বিজয়ের বিবাহ দিতে হইল। তারপর বিজয় ও সত্যব্রত দুইজনে একসঙ্গে সারদাশঙ্করের কলিকাতার বাড়ীতে থাকিয়া পড়িতে লাগিল। সত্যব্রত বাকী কয়টা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইল। তারপর আইন শিক্ষা সমাপন করিয়া সে গৃহে ফিরিল। বিজয়ের দুই বৎসর পূর্ব্বেই সত্যব্রত শিক্ষা শেষ করিয়া ফিরিল। বিজয়কে শিক্ষা শেষ করিবার জন্য কলিকাতাতেই থাকিতে হইল। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বেই সত্যব্রতের পিতামহীর স্বর্গবাস হইয়াছিল। পিতামহী মৃত্যুর পূর্ব্বে সত্যব্রতকে বলিয়া গেলেন, তোমার শ্বশুর ও শাশুড়ী আমাকে এ-কয়

বৎসর বড় সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া আসিয়াছেন, ঠিক যেন আমি তাঁহাদের সমকক্ষ। তোমার শ্বশুরকে ঠিক পিতার মতন দেখিও। তাঁহার কথা-মত চলিও। তাহাতে তোমার কোন অসম্মান হইবে না।

সত্যব্রত তাহাতে প্রতিশ্রুত হইল। সেও তাহা জানিত। পাঠ সাঙ্গ করিয়া আসিতে সারদাশঙ্কর বলিলেন, এখন তুমি ও বিজয় তোমাদের বিষয়-সম্পত্তি দেখ, আমাকে একটু বিশ্রাম দেও। বিজয় এখন লেখাপড়া শেষ করিতে পারে নাই। যতদিন না সে আসে, ততদিন তোমার উপরই সব ভার রহিল।......এখন তুমিই ম্যানেজার রহিলে। তারপর সে আসিলে দুজনের কার্য্য পৃথক্ করিয়া দিব। ইহাতে তোমার কাজ শেখাও হইবে, অথচ তোমার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে না। এই কার্য্যের জন্য তোমার বেতন নির্দ্দিষ্ট রহিবে। তুমি লও, লইবে; না লও, তোমার নামে আমি জমা করিয়া দিব।

সত্যব্রত বলিল, আপনি যেমন বলিবেন তেমনি হইবে।

সবই ভালভাবে চলিতেছিল। গোলমাল বাধিল এই লইয়া যে, সত্যব্রত সব পরীক্ষায় ভালভাবে বিনা সাহায্যে উত্তীর্ণ হইয়া সকলের সম্মান অর্জ্জন করিল ও সারদাশঙ্করের কাছ হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিল; আর বিজয়ের পিছনে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য এক-একটি প্রাইভেট্-টিউটর রাখিয়া তাহাকে পাশ করাইতে হইল। আইন পাশ না করিয়াই বিজয় ফিরিয়া আসিতে প্রয়াস পাইয়াছিল; কিন্তু পিতার কঠিন আদেশে তাহা সফল হয় নাই। কাজেই দুই বৎসর কলিকাতায় আরো পড়িয়া পাঠ সাঙ্গ করিয়া তবে বিজয়কে ফিরিতে হইল; এই সময় হইতে সত্যব্রতের উপর বিজয়ের ঈর্ষ্যা মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ-রেখার মত প্রকাশ পাইতে লাগিল। পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনায় তাহা ঝটিকাগমের মত সর্ব্বসমক্ষে আত্ম-প্রকাশ করিল।

ভুবনমোহিনী পাকা গৃহিণী ছিলেন। পুত্রের উপর তাঁহার অসীম প্রভাব ছিল। তিনি থাকিলে সকল দিক্ সাম্লাইতে পারিতেন। বাঁচিয়া থাকিতেই তিনি উমা ও সত্যব্রতের জন্য পৃথক্ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে তাহাদের কাহারও উপর নির্ভর করিতে না হয়, বা একসঙ্গে থাকিবার ফলে সংসারে ভবিষ্যতেও অশান্তির সূত্রপাত না হয়।

উমার এক পুত্র, বিজয়ের এক কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়। ভুবনমোহিনী পৌত্রের কন্যার ও পৌত্রীর পুত্রের মুখ দেখিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন। ইহার পর সারদাশঙ্করকে উপদেশ বা পরামর্শ দিবার আর কাহারও ক্ষমতা ছিল না। গৃহিণী রমাসুন্দরী অতি সরল ও ভীরুপ্রকৃতি ছিলেন। একটি মেয়ে ও একটি ছেলে, অগাধ ঐশ্বর্য্য, তবে কেন মেয়েটি পৃথক্ বাড়ীতে থাকিবে? একপ্রকার তিনিই স্বামীকে অনুরোধ করিয়া কন্যা-জামাতাকে আপনার কাছেই রাখেন। যখন তাহাতে কুফল ফলিল, তাহা বুঝিবার বুদ্ধি বা তাহার প্রতিকার করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। ক্রমে তাহা পূর্ব্বোক্তভাবে প্রতিকারের অতীত অবস্থায় পৌছিল।

৩

সারদাশঙ্কর ভাবিয়াছিলেন, সত্যব্রত জিদ করিবে যে, সে তাহার স্ত্রী-পুত্র সঙ্গেই লইয়া যাইবে। তিনি তখন তাহাতে বাধা দিবেন, আপত্তি তুলিবেন। ইহাতেই কয়দিন কাটিয়া যাইবে। ইহারই মধ্যে দুই পক্ষেরই রাগ পড়িয়া যাইবে, কাজেই সত্যব্রতের যাওয়া ঘটিবে না।

কিন্তু ঘটিল অন্যরূপ। সত্যব্রত না চাহিল স্ত্রী-পুত্রকে লইয়া যাইতে, না করিল তাহাদের সঙ্গে দেখা। সন্ধ্যায় সন্ধান লইতে জানা গেল, সে আহারাদি না করিয়া দুপুরের আগেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। অপর কেহ বুঝিতেও পারে নাই যে, সে কোথাও বাহিরে যাইতেছে। বাদানুবাদের পর সে অন্তঃপুরেও একবার যায় নাই; যে পরিচ্ছদে যেমন অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই বাহির হইয়া পড়ে। ষ্টেশন ৪ মাইল পথ। হাঁটিয়াই ট্রেণ ধরিয়াছে—সারদাশঙ্কর এ-সংবাদও পাইলেন।

সারদাশঙ্করের জামাতার উপর আক্রোশ বাড়িয়া গেল। এত অহঙ্কার! কোন জিনিষ—টাকাকড়ি—কিছুই সঙ্গে লইতে নাই! আচ্ছা, সারদাশঙ্করও জানে কি করিয়া দর্পীর দর্প ভাঙ্গিতে হয়। আপনি সাধিয়া শীঘ্রই তাহাকে ফিরিতে হইবে।

কিন্তু সারদাশঙ্করের বিপদ্ হইল উমাকে লইয়া। উমার মুখের দিকে যে তিনি চাহিতে পারেন না! কয়দিনেই তাহার মুখের হাসি যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে! ভাবিলেন, দুঃখ তো কিছু হইবেই; কিছুদিন গেলে ইহা সহিয়া যাইবে। তখন এতখানি আর বিষণ্ণতা থাকিবে না। ততদিনে জামাতাও ফিরিবে।

দেখিতে-দেখিতে তিন মাস কাটিয়া গেল। সত্যব্রত ফিরিল না; কোন পত্রাদিও তাহার আসিল না।

রমাসুন্দরী একদিন ভয়ে-ভয়ে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাগা, জামাই যে এত দিনেও ফিরিলেন না, কি হবে ?

সারদাশঙ্কর মনে মনে উদ্বিগ্ন হইতেছিলেন; কিন্তু তিনি স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, ফিরিলেন না তো তিনি কি করিবেন ?

রমাসুন্দরী চুপ করিয়া গেলেন। আর কিছু বলিতে তাঁহার সাহস হইল না।

বিবাদে বিজয়ের পক্ষ সমর্থন করিলেও সেই দিন হইতে তিনি বিজয়ের সঙ্গে প্রায় কথা বন্ধ করিয়াছিলেন। ব্যাপারটাকে একটু সহজ করিবার অভিপ্রায়ে বিজয় একদিন বলিল, সত্যর ব্যাপার দেখেচেন বাবা, তিন মাসের মধ্যে তার একখানা পত্র দেবারও সময় হ'ল না! অথচ সেই ঝগড়া করে গেল!

সারদাশঙ্কর গম্ভীর মুখে বলিলেন, একথা তোমার মুখে সাজে না। তুমিই এ-সবের মূল, তা কি মনে নেই?

বিজয় চুপ হইয়া গেল।

এ-সব কথা অন্দরে ও বাহিরে প্রচারিত হইয়া গেল। আর কাহারও এ-প্রসঙ্গ তুলিবার ক্ষমতা হইল না।

৪

একটা দুঃখের অন্ধকার সমস্ত পরিবারের মধ্যে ছাইয়া গেল; কিন্তু সে অন্ধকার দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে কাহারও সাহস হইল না। চুপ করিয়া থাকিয়া-থাকিয়া শেষে সারদাশঙ্করেরই অসহ্য হইয়া উঠিল! তিনি নিজেই যেন রাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাই বলিয়া কাহাকেও কি জোর করিয়া বলিতে নাই যে, সে জামাই, সহজেই তাহার অভিমান হইতে পারে, তাহাকে সম্মান করিয়া ফিরাইয়া আন! কাপুরুষ—ভীরু সব! এতটুকু সাহস নাই? অন্ধ—দৃষ্টি-হীন সব! তাঁহার গম্ভীর মুখ দেখিয়া সব পিছাইয়া যায়, তাঁহার হৃদয়ের সজল নয়নের পানে চাহিবার মত কাহারও চক্ষু নাই। তাঁহার নিজের উপর রাগ হইল, স্ত্রীর উপর

অসন্তুষ্ট হইলেন, পুত্রের উপর বিরক্তি বাড়িল। মনে হইল—এই ভাবের কোন ঘটনায় যদি বিজয় বা আর কেহ রাগ করিয়া চলিয়া যাইত, সত্যব্রত থাকিলে তাঁহার ভুল দেখাইয়া দিত, জোর করিয়া খোঁজ করিত। তাহার সহিত সে প্রসঙ্গ তুলিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনুরোধ করিত। আর ইহারা? সব অমানুষ!

এই চিন্তায় সারা রাতি জাগিয়া সকালে তিনি কাছারী-বাটীতে গেলেন। বলিলেন, আমি তোমাদের কাজ পরিদর্শন করিব। খাতাপত্র সব নিয়ে এস। কাছারীতে একটা ত্রাসের সাড়া পড়িয়া গেল। সহকারীরা গোপনে তৎক্ষণাৎ বিজয়ের কাছে সংবাদ পাঠাইয়া উদ্বিগ্ন-হৃদয়ে কাগজ-পত্র লইয়া আসিল।

সারদাশঙ্কর বলিলেন, খাতাপত্র সব আমার সামনে রেখে তোমরা পাশের ঘরে অপেক্ষা কর। আমি একাই সব দেখ্‌ব। যদি দরকার হয়, তোমাদের ডাক্‌ব।

তবু মন্দের ভাল। তাহারা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশের ঘরে গিয়া বসিল।

সারদাশঙ্কর ধীরভাবে গত কয়েক মাসের খাতাপত্র সাবধানে পরীক্ষা করিলেন। দেখিলেন, সত্যব্রত চলিয়া যাওয়া হইতে কাজকর্ম্মে বিশৃঙ্খলা হইয়াছে। আয়ও কমিয়াছে, খাতাপত্র তেমন ভাবে লেখা হয় না; কাজে তেমন সতর্ক দৃষ্টি নাই। একজন পুরাতন কর্ম্মচারীকে ডাকিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, খাতাপত্র এমন অসম্পূর্ণ কেন? পূর্ব্বে তো এমন ছিল না!

কর্ম্মচারী নীরব রহিল।

সারদাশঙ্কর চটিয়া উঠিলেন। উগ্রভাবে বলিলেন, তুমি পুরানো লোক, তোমারও উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই? সব অকর্ম্মণ্য?

কর্ম্মচারী ক্ষুব্ধ হইল, বলিল, অকর্ম্মণ্য নই।

"নও ? তবে মুখে কেন কথা নাই ?"

"আপনার রাগ বাড়িয়ে কোন লাভ নাই, তাই চুপ করে আছি। অকর্ম্মণ্য নই।"

কথাটা সত্য, তিনি রাগ চাপিয়া গেলেন। বলিলেন, কি কথা নির্ভয়ে বল। আমার রাগ দেখ্‌তে পাবে না।

"সত্যব্রতবাবু পরিশ্রমে অক্লান্ত ছিলেন। আর এমন নিয়মপূর্ব্বক কাজ করাতেন ও কাজ নিতেন যে, তাঁর সময়ে কাজ না করে উপায় ছিল না। এখন তাঁর অভাব হয়েছে। অথচ আপনিও কিছু দেখ্‌ছেন না। কাজেই এই অবস্থা।"

সারদাশঙ্কর আদেশ দিলেন, কমল-বিলের হিসাব নিয়ে এস।

হিসাব আসিল। সারদাশঙ্কর দেখিলেন, কমল-বিল খাসে আসিয়াছে ; কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা আয় কমিয়া গিয়াছে।—যাহার হাতে ব্যবস্থার ভার ছিল, তাহার ডাক পড়িল। সে ভয়ে ভয়ে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। সারদাশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, বিলের এমন অবস্থা কেন ?

লোকটি আমতা আমতা করিয়া বলিল, মাছ অত্যন্ত কমে গিয়েছে, জাল ফেললেও আজকাল কিছু পাওয়া যায় না।

"কেন, মাছগুলোর কি ক'মাসে পাখা হয়ে গেল যে, উড়ে পালাচ্চে ?"

"আজ্ঞে, এর উত্তর বিজয়বাবু দিতে পারবেন।"

বিজয়ের তলব হইল।

বিজয় সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না। বলিল, আমি তো কর্ম্মচারীদের উপর লক্ষ্য দিতে বলেছিলাম।

সারদাশঙ্কর গম্ভীরমুখে বলিলেন, "হুঁ, তুমি শুধু আদেশ হুকুম দিতে জান। হুকুমের সঙ্গে নিজে কাজ করতে জান না ও হুকুম তামিল্ হ'ল কি না, দেখ্‌তেও জান না।"

তখন নৃসিংহ ঘোষের তলব হইল। নৃসিংহ ঘোষ আসিলে তিনি বলিলেন, তুমি বিল জমা এখন নিতে চাও?

"আজ্ঞে, না।"

সারদাশঙ্করের মুখ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধ দমন করিয়া বলিলেন, কেন?

নৃসিংহ ঘোষ বলিল, যদি অভয় দেন তো বলি।

সারদাশঙ্কর বলিলেন, বল।

নৃসিংহ ঘোষ বলিল, শুধু আমার জন্য, আমাকে বিল জমা দেওয়ার জন্য জামাইবাবুকে দেশ ছাড়তে হয়েছে, এ দুঃখ আমার ম'লেও যাবে না।

বলিয়া বিশালদেহ নৃসিংহ ঘোষ কাঁদিয়া ফেলিল।

সারদাশঙ্কর বিচলিত হইলেন। মুখে সে ভাব না দেখাইয়া বলিলেন, আমি যদি তোমাকে ঐ বিল নিতে আদেশ করি?

নৃসিংহ চক্ষু মুছিয়া বলিল, তাহলে নিতে আমি বাধ্য।

সারদাশঙ্কর বলিলেন, আজ থেকে পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে ঐ বিল তোমার অধিকারে রইল।

তৎক্ষণাৎ এই সম্বন্ধে লিখিত আদেশ দিয়া সারদাশঙ্কর বাসভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আপনার ঘরের দুয়ার বন্ধ করিলেন।

তখন যদি কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে প্রবল-প্রতাপ, গম্ভীর, শক্তিমান্ সারদাশঙ্করের চক্ষে অশ্রু দেখিত।

৫

সারদাশঙ্কর ভাবিতেছিলেন, সত্যব্রতের কি দোষ ছিল? কেন তাহার সহিত রূঢ় ব্যবহার করিলেন? তিনি তাহাকে যে ক্ষমতা দিয়াছিলেন, সে তাহার নির্ভীক সঙ্গত ও ন্যায়যুক্ত ব্যবহার করিয়াছিল মাত্র। যাহার জন্য তাহার প্রশংসা প্রাপ্য ছিল, তাহার জন্য সে তিরস্কৃত হইল! অথচ তাহার সন্ধান লওয়া হইল না! আজ তাঁহার মা থাকিলে, কি করিতেন? কি বলিতেন? তিনি কি বলিতেন না—'বাবা, তুমি যে বলিতে কন্যাকে-পুত্রকে একই স্নেহে পালন করিবে, পুত্রকে ও জামাতাকে একই চক্ষে দেখিবে—ইহা কি সেই প্রতিজ্ঞারই ফল?' তিনি ভাবিতে লাগিলেন—কি করিবেন!

হঠাৎ মনে হইল—কে যেন ডাকিল! রুদ্ধ কবাটের বাহির হইতে কাহার যেন করাঘাতের শব্দ হইল। শব্দ যেন অতি মৃদু। সারদাশঙ্কর কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন, এবার শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন,—"দাদু! দাদু!"

চিনিতে বিলম্ব হইল না, ইহা উমার শিশু-পুত্রের কণ্ঠস্বর। তাঁহার স্নেহের দৌহিত্র দুয়ারে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিতেছে। তিনি উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিলেন।

মাত্র আড়াই বছরের শিশু। সে মাতামহের বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া বলিল, দাদু, বাবা কোথায় গেল?

সারদাশঙ্করের মুখে কে যেন তীব্র কশাঘাত করিল! তিনি

বালককে সাদরে কোলে তুলিয়া লইলেন। সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, তোমার বাবা বেড়াতে গেছেন, আবার আস্‌বেন।

বালক মৃদুস্বরে বলিল, আচ্ছা। আবার জিজ্ঞাসা করিল, বাবা আমায় কোলে নেবে?

সারদাশঙ্কর বলিলেন, নেবেন বৈকি ভাই! তোমার বাবা আবার তোমায় কোলে নেবেন, তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবেন। তোমার সঙ্গে খেলা কর্‌বেন।

বালক দুঃখ ভুলিয়া গেল, একটু পরে মাতামহের কোল হইতে নামিয়া হেলিতে-দুলিতে সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

দ্বিপ্রহরে সারদাশঙ্কর আসিয়া আহারে বসিলেন মাত্র। আহার মুখে রুচিল না। রমাসুন্দরী কাছে বসিয়া ছিলেন। বলিলেন, খেতে পাচ্ছ না কেন? রমাসুন্দরীর গলা ভারি। কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়া সারদাশঙ্কর মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন, চক্ষুদুটি লাল!

স্বামীর আহার সমাপ্ত হইতে, রমাসুন্দরী কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "খোকা আজ এসে উমাকে কি বল্‌ছে জান?"

সারদাশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, কি?

রমাসুন্দরী বলিলেন, বল্‌ছে, 'মা, বাবা আস্‌বে, কোলে নেবে; দাদু বলেছে!' তাই শুনে খোকাকে কোলে নিয়ে উমার কি কান্না! মেয়েটা মন গুমরে-গুমরে যে গেল! কখনো তোমায় জোর করে কিছু বলিনি। আজ বল্‌ছি, এর উপায় কর। জামাইকে আনাও।

সারদাশঙ্কর আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বলিলেন, আমি না হয় রাগের বশে, তাকে একটা কথা বলে ফেলেছিলাম। তোমরা ত ছিলে, তোমরা কেন তাকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করনি? আমায় কেন বলনি যে, উমার কষ্ট হয়েছে, উমা দুঃখ সইতে পার্‌ছে

না! আজ উমার ছেলের দুঃখে তোমাদের সব দুঃখ হ'ল। উমার দুঃখে কেন হয়নি?

তিনি ধীরে ধীরে অন্তঃপুর ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন।

মুহূর্ত্ত-মধ্যে বাহিরে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। সারদাশঙ্করের কাছে সকলের ডাক পড়িয়া গেল।

বিজয়কে প্রথম জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যব্রতের কোন সন্ধান করেছ?

বিজয় বলিল, আজ্ঞে, না।

"কেন?"

"আপনার কঠিন নিষেধ ছিল।"

"হুঁ।"

এইরূপে অন্যান্য বিশেষ-বিশেষ কর্ম্মচারিগণের ডাক পড়িল। সকলেরই কাছ হইতে প্রায় একই উত্তর আসিল।

শেষে বৃদ্ধ দেওয়ানের পালা আসিল।

দেওয়ান আসিলেন। তাঁহাকে বসিতে আসন দেওয়া হইলে তিনি বসিলেন।

সারদাশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ, আপনার কাছে কিছু প্রত্যাশা করতে পারি?

দেওয়ান প্রশ্ন করিলেন, কি সম্বন্ধে?

"সত্যব্রতের কোন সন্ধান করেছেন?"

"করেছিলাম।"

"কি সন্ধান পেয়েছেন?"

"সম্যক্ সন্ধান পাইনি। কেবল এইটুকু সন্ধান পেয়েছি, সত্য সেই ঘটনার পরেই ষ্টেশনে যান, সেখান থেকে একখানা কলকাতার থার্ডক্লাসের টিকিট কেনেন। তারপর কলকাতার অনেক পরিচিত লোককে পত্র

লিখেছি ; সন্ধান পাইনি। ভেবেছিলাম, অন্য অজুহাতে ছুটি নিয়ে নিজে একবার যাই। এমন সময় আপনার এই সুবুদ্ধি হয়েছে।"

"এত যদি করেছিলেন তো আমাকে এ-বিষয়ে পরামর্শ বা উপদেশ দেন নি কেন ?"

"কেন যে দেইনি তা'তো জানেন। আপনার সমস্ত গুণসত্বেও আপনি যে পরামর্শ বা উপদেশের অতীত। আজ আপনার নিজের দুঃখ বা অনুতাপ হয়েছে, তাই ডেকে জিজ্ঞাসা কচ্চেন এবং এই মত সহ্য কচ্চেন, কারণ, এখন আপনারও এই মত।"

"আপনি সব চেয়ে পুরাতন ও প্রধান কর্ম্মচারী ; আমাকে বুঝিয়ে মত বদ্‌লাবার চেষ্টা কর্‌লেই তো পার্‌তেন !"

"সে কাজ অসাধ্য, তাই সে চেষ্টা করিনি। আর তা কর্‌তে গেলে আপনি মত বদ্‌লাতেন না, হয়ত দেওয়ান বদ্‌লাতেন।"

"আমি হিতৈষীর মর্য্যাদা বুঝিনে—এ কথা আপনি বলেন !"

"বাধ্য হয়ে বল্‌তে হচ্চে, ক্ষমা কর্‌বেন। আপনার আগেকার আদেশ সব মনে করে দেখুন ! তারপর আর একটা কথা ভাবুন, সত্যবাবুর মত ন্যায়বান্ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও আপনার জমিদারীর হিতাকাঙ্ক্ষী আমি কখন দেখিনি। তাঁর কাছ থেকে বিজয় বহুকাল এখনও শিখ্‌তে পারেন ; আপনি তো হিতৈষীর সম্মান রাখেন নি !"

সারদাশঙ্কর ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, দেওয়ান মহাশয়, আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনি যে জ্ঞান শিক্ষা দিলেন, তা এবার থেকে মনে রাখ্‌ব। জ্ঞান হয়ত একদিন আসেই, কিন্তু কখন কখন বড় বিলম্বে। আজ থেকে সত্যব্রতের সন্ধানের ভার প্রকাশ্যেই আপনাকে দিলাম। আপনি সব কাজ ত্যাগ করে, যেমন করে পারেন তাকে ফিরিয়ে আনুন। খরচ-পত্র যা

লাগে, অনুমান করে নিয়ে যান্। উমার দুঃখ আমি আর সইতে পারচি না।

দেওয়ান বলিলেন, আমি কালই তাঁর সন্ধানে বার হ'ব। আমার যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

দেওয়ান তখন সে-স্থান ত্যাগ করিলেন।

৬

মায়ের পরেই উমার দুঃখ বুঝিত বিজয়ের স্ত্রী অরুণা। দেওয়ান চলিয়া যাওয়ার একটু পরেই উমার নামে এক পত্র আসিল। পত্রখানি পোষ্টকার্ডের উপর লেখা—উপরের ঠিকানায় লেখা—C/o সারদাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সারদাশঙ্কর বুঝিলেন পোষ্টকার্ডে লেখার কারণ, তাঁহার নিষেধ যে, উপযুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে যেন তাঁহার কন্যাকে লইয়া যাওয়া না হয়। একবার ইচ্ছা হইল পত্রখানি পড়িয়া দেখেন। পরমুহূর্ত্তে সে ইচ্ছা দমন করিয়া অন্তঃপুরে সে-পত্রখানি পাঠাইয়া দিলেন।

উমা তখন কার্য্যান্তরে ব্যস্ত ছিল। পত্র পড়িল গিয়া অরুণার হাতে। অরুণা পত্র পড়িয়া দেখিল, সত্যব্রত লিখিয়াছে। পত্রের উপর একবার মাত্র চোখ বুলাইয়া লইয়া অরুণা উমার খোঁজে ছুটিল। উমা আপনার শয়ন-কক্ষে দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া আপন হস্তে কক্ষটি পরিষ্কার করিতেছিল। মেঝেটি পূর্ব্বেই পরিষ্কৃত ছিল। তথাপি আপন অঞ্চল দিয়া আবার ঝাড়িল। একখানি শুভ্র বস্ত্রখণ্ড জলে ভিজাইয়া নিংড়াইয়া লইয়া বেশ করিয়া মেঝেটি মুছিল। স্বামীর শয্যাটি সুন্দর করিয়া পাতিল। তাঁহার

প্রিয় যে গ্রন্থ কয়েকখানি সে-কক্ষে থাকিত, তাহা সযত্নে মুছিয়া যথাস্থানে রাখিল। দেওয়ালের গায়ে দুইখানি স্বামীর আলোক-চিত্র। একখানি বিবাহের সময়কালের তোলা—স্বামীর পাশে সেও আছে। দুজনে তখন বালক-বালিকা, বালক বরের পাশে বালিকা বধূ নিঃসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া আছে। পিতামহী দুজনের হাতে হাত দিয়া দিয়াছিলেন, সেই ভাবেই ছবি উঠিয়াছে। বালিকা-জীবনের কত কথা মনে পড়িল। সেদিন আর এদিন!

আর একখানি স্বামীর মাস-ছয়েকের পূর্ব্বের তোলা ছবি। স্বামী তোলাইতে রাজী হন নাই। অনর্থক ছবি তোলার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। রাত্রে কত করিয়া অনুরোধ করিয়া তবে উমা রাজী করিয়াছিল। ভাগ্যে ছবিখানি এত করিয়া তোলাইয়াছিল তাই, ত' ছবি দেখিতেও পাইতেছে! নইলে কি লইয়া থাকিত?

উমা ছবির দিকে চাহিল। দেখিল সেই সুন্দর মধুর মুখ, যাহাতে অন্তরের তেজ, উদারতা ও পবিত্রতার পূর্ণ প্রকাশ ফুটিয়া উঠিয়াছে! উমার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে সে ছবির পানে চাহিয়া আপন মনে বলিল, তুমি কেন হঠাৎ রাগ করিয়া চলিয়া গেলে? গেলে তো আমাকে কেন এমন করিয়া ফেলিয়া গেলে? আমাকে কেন সঙ্গে লইয়া গেলে না? কোথায় গেলে, তাহা কেন বলিয়া গেলে না? কোন দিন একটা কঠিন কথা তুমি বল নাই, আজ কেমন করিয়া এমন কঠিন হইলে? কোথায় গিয়াছ, কোথায় আছ—একটা খবর দাও; যেখানে আছ, সেখান হইতে তোমার হাতের লেখা একটুকু পাঠাইয়া দাও! নইলে কি লইয়া আমি থাকিব?

এমন সময়ে অরুণা দুয়ারে করাঘাত করিয়া ডাকিল, ঠাকুরঝি, কি করছ ভাই, শীগ্‌গির দুয়োর খোল।

উমার চোখের জল মুছিতে, শান্ত হইতে একটু দেরী হইল। অরুণা আবার ডাকিল, একা কি করছ ভাই, দুয়োর খোল। কি এনেছি দেখ।

উমা উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। অরুণা কক্ষে প্রবেশ করিয়া তখনি দুয়ার বন্ধ করিয়া উমার পানে চাহিল। বুঝিল, উমা একটু আগে কাঁদিতেছিল। কিন্তু সে প্রসঙ্গ তখন না তুলিয়া তাহার হাতে চিঠি গুঁজিয়া দিয়া বলিল, এত ভাবছিলে ভাই, এই দেখ ঠাকুর-জামাইয়ের চিঠি এসেছে।

উমার বক্ষ দুরু-দুরু করিয়া উঠিল। চিঠি আসিয়াছে! এই মাত্র সে বলিয়াছিল—'অন্ততঃ হাতের লেখা একটুকু পাঠাইয়া দাও।' সে প্রার্থনা তুমি শুনিয়াছ!

আকুল আগ্রহে সে পত্র পড়িতে লাগিল।

কল্যাণীয়াসু—

আমি আসিবার সময় কিছু বলিয়া আসিতে পারি নাই। তাহার জন্য দুঃখ করিও না। ভাবিও না আমি রাগ করিয়া আসিয়াছি বা আর ফিরিব না। বাবা রাগ করিয়া যদি কিছু বলিয়া থাকেন, তাহাও তাঁহার আশীর্ব্বাদ। আমি ভাল আছি। সুবিধা হইলেই ঠিকানা দিব বা যাইব। তোমাদের খবর আমি মাঝে মাঝে পাই। আমার জন্য ভাবিও না। মা ও বাবাকে প্রনাম করিতেছি। বিজয়-দাদুও বৌদিদিকে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইতেছি। তোমাকে ও খোকাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

—শ্রীসত্যব্রত

দীর্ঘ তিন মাস পরে একখানা পত্র আসিল। হউক পোষ্টকার্ডে কয়েক ছত্র লেখা, তবু তো তাঁহার পত্র! কতদিনে ফিরিবেন, কোথায় আছেন, কিছুই লেখেন নাই। পাছে কেহ তাঁহার খোঁজ করেন! আর

কাহাকেও না লিখুন, গোপনে আমাকে সে-কথাটা কেন লিখিলেন না, আমি কেমন করিয়া কি লইয়া দিন কাটাইব ?

উমা অরুণার কাঁধে মাথা রাখিয়া বালিকার মত ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অরুণা কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিল।

৭

১৫-নম্বর মণিরাম বাবু ষ্ট্রীটের বাড়ীর দরজার বামদিকে একদিন অপরাহ্নে প্রায় ভিড়ের মত হইয়াছিল। ভিড়ের কারণ, বাম দিকে থামের উপর একটি হাতে-লেখা বিজ্ঞাপন। একখণ্ড হলদে রঙের কাগজ, তাহাতে এই কথা কটি লেখা ছিল :—

বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য অবিলম্বে এই বাড়ীতে একজন উপযুক্ত ও শিক্ষিত কর্ম্মচারীর প্রয়োজন। সকল প্রকার গৃহস্থালী কার্য্যের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অব্রাহ্মণের আবেদন অগ্রাহ্য। শিক্ষা ও চরিত্রের প্রমাণসহ অপরাহ্ণ পাঁচ ও ছটার মধ্যে সাক্ষাৎ করিতে পারেন। বেতন গুণানুসারে।

বিজ্ঞাপন পড়িয়া কেহ বলিল, বাজে,—একেবারে বোগাস্! অনর্থক সময় নষ্ট।

কেহ বলিল,—হতভাগ্য বেকারদের উপর এ একটা Practical joke.

একজন বলিল,—না হে না, ভেতরে কিছু থাকতে পারে। আমি প্রথমেই হাওড়া ষ্টেশন থেকে বার হয়ে পুলের কাছাকাছি এই রকম একটা কাগজ দেখি। তাতে লেখা ছিল—'হ্যারিসন রোড ও কলেজ-ষ্ট্রীটের মোড়ের মাথায় সন্ধান কর।' সেখানে এসে আর একটা বিজ্ঞাপন দেখি—'কালীতলার মোড়ে সন্ধান কর।' কালীতলার মোড়ে এসে দেখি এখানকার ঠিকানা।

অপর একজন বলিল, বোধ হয় এর ভিতর কোন রহস্য আছে তাহলে। আমি Esplanade-এও এ রকম বিজ্ঞাপন দেখি, তারপর ঘুরতে ঘুরতে এখানে।

একজন সাবধানী বেকার বলিল, কাজ নেই ভিতরে গিয়ে। হয়ত সেখানে গিয়েও একটা ঘর থেকে আর একটা ঘরে যেতে যেতে শেষে এমন জায়গায় পৌছান যাবে, যেখান থেকে কাপড়খানি আর পকেট সুদ্ধ জামাটি দক্ষিণে দিয়ে তারপরেই একখানা ন্যাকড়া পরে বেরুতে হবে।

কথাটা শুনিয়া যাহাদের পকেটে সত্যিকার কিছু ছিল, তাহাদের একটু খটকা লাগিল। তাহারা পিছাইল। কেহ কেহ ভিতরে গেল।

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটি সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া ছিলেন। দরজা হইতে একটু দূরে এক কর্ম্মচারী বসিয়া কর্ম্ম·········নিকটে কার্ডের অভাবে এক্কখণ্ড কাগজে তাহাদের নাম লিখাইয়া লইয়া একসঙ্গে উক্ত প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কাছে পাঠাইয়া দিতেছিল। তিনি ভিতর হইতে এক এক করিয়া ডাকিয়া পাঠাইতেছিলেন। প্রথমে যে লোকটি আসিল সে নব্য যুবক, পোষাক-পরিচ্ছদও তদনুযায়ী। গায়ে

চুড়িদার পাঞ্জাবী, মিহি ধুতি, ভিতরে হাফ্ট্রাউজার, মণিবন্ধে ঘড়ি, পায়ে সেলিম জুতা, মাথায় কাব্যের কেশ।

ভদ্রলোকটির পরণে ধবধবে ফরসা মোটা ধুতি, গায়ে তেমনি ধবধবে একটা ফতুয়া। আগন্তুককে বসিতে বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারই নাম রতিকান্ত ঘোষাল?

উত্তর হইল, হ্যাঁ।

"আপনার নিবাস?"

"আপাততঃ হরিধন লেন।"

"ভবিষ্যতে কোথায়?"

"যেখানে চাকরি পাব। আপনার এখানেও হতে পারে।"

"অর্থাৎ আপনার বাড়ী বা দেশ নেই?"

"কেন থাকবে না? তবে আমি সেটা বলতে প্রস্তুত নই।"

"ওঃ সে কথা স্বতন্ত্র। আপনার শিক্ষা কি পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

"ম্যাট্রিক Standard পর্য্যন্ত পড়া আছে।"

"পাশ করেন নি কেন?"

"চোখের অসুখে ছেড়ে দিই।"

"তা বেশ করেছেন। এখন দেখতে পাচ্চেন তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তা কি কাজ জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

"অবশ্যই। কাজ হচ্ছে দ্রৌপদীর।"

"তার মানে?"

"জানেন না?" মহাভারত পড়েন নি?"

"পড়ব না কেন!"

"তাহলে ভুলে গেছেন। সূপ তৈয়ারী করতে জানেন?"

"কিসের সূপ ?"

"যে জিনিষের দরকার হবে তারই। ধরুন দালের, আলুর, পাখীর, মাংসের।"

"কিন্তু কাজ বল্লেন না তো ?"

"সূপকার।"

"আপনি বলছেন কি ! রান্নার কাজ নাকি ? আপনি যে লিখেছেন বিশেষ আবশ্যকীয় কর্ম্ম !"

"তাতো বলেছিই। রান্নার চেয়ে আবশ্যকীয় কাজ আছে আর ? আপনি পারবেন কি না তাই বলুন। আর কোথায় করেচেন ? সার্টিফিকেট আছে ?"

"রান্নার কাজ তার আবার সার্টিফিকেট ! ও-কাজের জন্য আমি আসিনি।"

"বেশ তাহলে আসুন, নমস্কার।"

বোবাল চলিয়া গেল। মুখুজ্যে আসিল।

মুখুজ্যে আই, এ, পাশ। দ্রৌপদীর কাজ করিতে হইবে শুনিয়া সে দু'কথা বেশ করিয়া শুনাইয়া দিয়া অনেকটা গর্ব্ব-ভরেই চলিয়া গেল।

এইভাবে বহু ভদ্রলোক কাজ প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া গেল।

ভাবে মনে হইল, কোন ভদ্র ও শিক্ষিত যুবকই ও-কাজের জন্য প্রস্তুত নহে। অথচ গৃহকর্ত্তার ইচ্ছা যে কোন শিক্ষিত লোককে এই কর্ম্মে নিযুক্ত করেন।

পরিশেষে এক সুদর্শন যুবক আসিল। তাহাকে দেখিলেই ভদ্রবংশীয় বলিয়া মনে হয়। তাহার নাম নিত্যধন দেবশর্ম্মা, বাংলা বেশ জানে, ইংরাজীও কিছু জানে এবং সে রন্ধন করিতেও প্রস্তুত। যদিও রন্ধনের সার্টিফিকেট তাহার নাই।

কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার উপাধি কি? দেবশর্ম্মা তো সকলেই। উত্তর হইল—আমি আপনাকে দেবশর্ম্মা বলিতে চাহি। তবে আমরা কাশ্যপ-গোত্র।

কর্ত্তা বলিলেন, তাহলে সাদা কথায় বলুন যে আপনারা চট্টোপাধ্যায়। আপনি বর্ণাশ্রম মানেন?

"আজ্ঞে মানি।"

"আপনি কার সন্তান?"

"শান্তনু দেবশর্ম্মার সন্তান।"

"শান্তনু চাটুজ্যের বলুন। গায়ত্রী দিন-রাতে কতবার জপ করেন?"

"সকালে ও সন্ধ্যায় করি।"

"গায়ত্রী মনে আছে বোধ হয়?"

"আছে। নইলে জপ করা একটু কঠিন হ'ত।"

"তা বটে। প্রভাতবাবুর আমার উপন্যাস বেরুবার পর থেকে গায়ত্রীটা সবই মুখস্থ করে রেখেছি। ওতে কিছু বুঝা যায় না।"

"আপনি কি বুঝতে চান? আমি ব্রাহ্মণ কি না এই তো?"

"ঠিক ধরেচেন। জানাটা দরকার কি না বলুন তো? হাতে খাওয়া মানে প্রাণটা তার হাতে ধরে দেওয়া। যার হাতে খাব, সে ব্রাহ্মণ কি না জানাটা সর্ব্বাগ্রে দরকার নয় কি? প্রভাতবাবুর 'প্রত্যাবর্ত্তন' পড়েছেন তো? দেখেছেন তো রজক দিব্যি জাত ভাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণের সঙ্গে খেতে বসে গেছে! যখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে খেতে বসতে কোন দ্বিধা নেই, তখন ব্রাহ্মণ সেজে রান্না-ঘরে রাঁধতেই বা বাধা কি? এ অবস্থায় হাতে খাওয়ার আগে একটু খোঁজ নেওয়া উচিত নয় কি?"

"কি হলে আপনার প্রত্যয় হয় বলুন। আমি উপবীতের গ্রন্থি দেওয়ার

নয় জানি, গণ্ডুষের মন্ত্র ভুলে যাইনি, শৌচে যাবার সময় গোপনে লক্ষ্য করে দেখ্‌বেন—আমি কাণে উপবীত দিই কি না।"

"বাস্, তাহলেই হ'ল। আমার বিশ্বাস হচ্চে আপনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ। লেখাপড়া কতদূর করেছেন ?"

"মোটামুটি জানি। আপনার অনুমতি হ'লে পাক্‌প্রণালী দেখেও রাঁধতে পারি।"

"আপনি ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করেছেন কি না তাই জানতে চাই। কারণ ম্যাট্রিক পাশ না হ'লে আমি একাজে নিযুক্ত করব না।"

"আমি ম্যাট্রিক পাশ করেছি।"

টেবিলের উপর একস্থানে কতকগুলি ফুলস্‌ক্যাপ কাগজ কাটা ছিল। পাশে একখানি ইংরাজী বই ছিল। গৃহকর্ত্তা একখানি কাগজ ও দোয়াত-কলম যুবকের হাতে দিয়া ইংরাজী বইখানির একটি চিহ্নিত স্থান দেখাইয়া বলিলেন, এই জায়গাটির ইংরাজীতে ও বাংলাতে আপন ভাষায় মর্ম্মার্থ লিখুন।

নিত্যধন কাগজ লইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া একবার পড়িয়া লইয়া লিখিতে লাগিল ও মিনিট দশেকের মধ্যে দুইটিই লিখিয়া দেখিতে দিল। গৃহকর্ত্তার পছন্দ হইল। তিনি বলিলেন, আপনি থাকুন, বেতন ১৫৲ টাকা আর বিনামূল্যে আহার, বাসস্থান ও পরিচ্ছদ…। তবে স্বভাবটা যেন নির্ম্মল থাকে, সেইটার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন। স্বভাবের যেন কোন নিন্দা শুনি না। সাবধান! আপনি যান্, আজ এই সামনের ঘরে বিশ্রাম করুন, কাল থেকে কাজের ভার পাবেন।

নিত্যধন নমস্কার করিয়া নির্দ্দিষ্ট ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। গৃহকর্ত্তা একবার সতর্ক দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া দেখিলেন।

কর্তার নাম সূর্য্যপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়। বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তির অধিকারী, সুশিক্ষিত ও অধ্যয়নানুরাগী। দোষের মধ্যে কেবল একটু খেয়ালী। বেশীর ভাগ সময়ে কলিকাতায় থাকেন, মাঝে মাঝে দেশে যান। দেশ মেদিনীপুরে।

চতুর ও পুরাতন ভৃত্য নবীন আসিয়া বলিল, বাবু যে বামুন রেখেছেন ওকে ভাল বোধ হচ্ছে না।

"কেন ?"

"ওকে যেন 'টিক্‌টিকির' লোক বলে মনে হয়।"

"কেন হয় তাই বল !"

"ওর চাল-চলন দেখে।"

"দেখ, নবীন, আমি জেরা কর্‌ব তুমি-তবে তার উত্তর দেবে, ওরকম কোরো না। তুমি পুরানো চাকর, সেজন্য তোমায় জিজ্ঞাসা করবার বা মতামত দেবার অধিকার দিইছি ; কিন্তু এক সঙ্গে যা বল্‌বে একেবারে আমাকে বলে দাও।"

"তাই বলছি বাবু। আপনার নতুন বামুন যাচ্ছেতাই আরম্ভ করেছে। আপনি কিছু দেখেন না, দিদিমণিরাও কিছু দেখেন না, সেজন্য ওর আরও সুবিধা হয়েছে। রান্না চড়িয়ে বসে বসে পড়ে। আমি একদিন বলেছিলাম, ঠাকুর, যদি বই পড়্‌বে তো কলেজে গেলেই তো হ'ত, হেঁসেলে কেন ঢুক্‌তে গেলে ? তা আমায় জবাব দিলে, তোমার রান্নার

যদি কিছু ক্ষতি হয়, তোমরা যদি সময় মত খেতে না পাও, তখন ব'লো; আমি রাঁধতে রাঁধতে কি করি, তা দেখবার তোমার দরকার কি ?"

"তা ঠিক কথাই বলেছে। সময় মত সবাইকে খেতে দিচ্চে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাঁধচে, তার মধ্যে যদি ও পড়ে, তাতে আর ক্ষতি কি ?"

"আপনি বল্লেন, ক্ষতি কি! কিন্তু খরচটা একবার দেখ্ছেন ? আপনি ওকে একেবারে ঢালাও হুকুম দিয়েছেন, তার আর ও করবে না কেন বলুন ? রান্নাঘরের দুয়োর-জানালা সব বদলে ফেলে সব জালের তৈরী হয়েছে। বল্লে মাছি আসবে না, অথচ আলো ও বাতাস আসবে। তারপর যখন চোর ঢুকবে তখন ? বাবু উত্তর দিলেন, মাছির চেয়ে কি আর বড় চোর আছে ? তারা যেমন দিনে-দুপুরে চুরি করে, তেমনি চুরি করে সব চেয়ে সেরা জিনিষ মানুষের প্রাণ। ও সব কেতাবি-কথা মুখ্যু মানুষ বুঝিনে, তবে এ সব খরচ দেন, তাই না ও করে।"

কর্ত্তা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কই আমি তো কোন খরচ ঠাকুরকে দিইনি! বরং মাস গেলে বাজার-খরচের টাকা থেকে ৫৲ টাকা আমাকে ফেরৎ দিয়েছে ঠাকুর। আমি তো জানিও নি যে রান্নাঘরে কোন একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়েছে!

তারপর একটু ভাবিয়া বলিলেন, চল তো দেখে আসি ব্যাপার কি! ও আমার কাছে খরচ চাইলে না, নিলে না, অথচ কি করে জানালা-দরজা বদলালে দেখে আসি।

তখন বেলা আন্দাজ আটটা হইবে।

বৃহৎ অট্টালিকার বহিরংশ পার হইয়া নবীন ও কর্ত্তা বৃন্দনের অংশে আসিলেন। দেখিলেন, সত্যই প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কাঠের দুয়ার-জানালাগুলির পরিবর্ত্তে বেশ সূক্ষ্ম জালের কপাট। ঘরের ভিতর প্রচুর বায়ু। গৃহমধ্যে একটি মাছিরও প্রবেশাধিকার নাই। ছাদের উপর একটা

চিম্‌নির ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, যাহাতে ধুঁয়া সব উঠিয়া বাহিরে চলিয়া যায়। যে দুইটি উনান ছিল, তাহা ছাড়া আর একটি পাঁচ-মুখো বড় উনান তৈয়ারি হইয়াছে; তাহাতে একসঙ্গে তিনটি তরকারী হইতেছে, একটিতে গরম জল ফুটিতেছে, একটিতে দাল চড়িয়াছে।

কর্ত্তা ডাকিলেন, নিত্যধন!

নিত্যধন কর্ত্তাকে রান্নাঘরে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

কর্ত্তা বলিলেন, নিত্যধন, তুমি রান্নাঘরে একেবারে বিপ্লব বাধিয়েছ; এ সব দুয়ার-জানালা বদ্‌লেছ, টাকা পেলে কোথায়?

নিত্যধন বলিল, আপনি একমাসের মাহিনা দিয়াছিলেন, তাহা থেকে।

কর্ত্তা। তা আমাকে বলনি কেন?

নিত্য। এ আমার নিজেরই কাজ মনে করি, সে জন্য আর বলিনি।

কর্ত্তা। তা তোমার খরচে আমি খাব কেন?

নিত্য। আমার টাকায় তো আপনি খাচ্চেন না। রান্না জিনিষে যদি মাছি বসে, আমি যদি মাছি তাড়াই, তাহলে যেমন তার জন্যে আপনার কাছে বেশী মাইনে চা'বনা, সেটা আমার কর্ত্তব্যের মধ্যে মনে করি, এও তেমনি করেছি। মাছি যাতে ঘরের মধ্যেই না আসতে পারে, সেইরকম ব্যবস্থা করেছি।

কর্ত্তা। আগেকার দুয়ার-জানালাগুলো কোথায় গেল?

নিত্য। ভাণ্ডার-ঘরের দুয়ার-জানালা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, সেটা বদ্‌লে লাগিয়ে দিয়েছি।

কর্ত্তা। এ সব কে করলে—কখন করলে?

নিত্য। অবসর মত নিজেই করেছি। কেবল ছুতোরকে একবার ডেকে তার কাছ থেকে একটু সাহায্য নিয়েছিলাম।

কর্ত্তা। তুমি তো তাহলে গুণীলোক দেখছি। বাড়ী থেকে রাগ-টাগ করে আসনি তো? মা-বাপ আছেন?

নিত্য। আজ্ঞে বহুপূর্ব্বে আমার মা-বাঁপ দুজনেই মারা গেছেন; কাজেই রাগ বা অভিমান করবার আমার খুব কম লোকই আছেন।

কর্ত্তা। তুমি এখানে থাক নিত্যধন, তোমার স্নেহের অভাব হবে না। বরং তোমার পরিশ্রম যাতে কম হয়, তার জন্য একজন তোমার সহকারী রেখে দেব। আমি তোমার মত এমন একজন লোক চাই, যে সব কাজ আপনার কাজ মনে করে করবে। আমি তোমার কাজে বেশ সন্তুষ্ট হয়েছি। কাজ ভাল করে করবার জন্য বা পরিষ্কার করবার জন্য তোমার যা খরচ হয়, আমার কাছ থেকে নেবে।

ইত্যবসরে নবীন দেখিল বেগতিক। তখন কর্ত্তা তাহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করিবেন এই আশঙ্কায় সে সরিয়া পড়িল।

কর্ত্তা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, দেখ নিত্যধন, একটা কথা তোমাকে বলি; তুমি বুদ্ধিমান্, কিছু মনে করো না। বাড়ীর ভেতরে যাবে, মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইবে, তাতে যেন কোন সংযমের ত্রুটি হয় না। আমি এই জন্যই—যে-সে ঠাকুর রাখতে চাইনে। তারা না জানে স্বাস্থ্যতত্ত্ব, না বোঝে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মূল্য, না আছে তাদের চরিত্র বলে কোন জিনিষ। অথচ ঐ জাতের লোককে আমরা নিঃসঙ্কোচে অন্তঃপুরে ছেড়ে দেই।

নিত্যধন। আপনি ঠিক কথা বলেছেন। আপনার মেয়েরা আমার ভগ্নীর মতন; আপনি পিতৃতুল্য। এ সম্বন্ধে আমি একটু ভেবেও রেখেচি। আমার রান্না হবে, আপনাকে খাইয়ে সকলের জন্য বেড়ে রেখেও বাইরে যেতে পারি। ওঁরা খেয়ে নিলে তবে আসতে পারি। থালায় আমি

নম্বর দিয়ে পৃথক্ পৃথক্ থালার ব্যবস্থা করে বেড়ে দিতে পারি। তাহলে আমার সাম্‌নে এঁদের বেরুতেও হবে না।

কর্ত্তা। না নিত্যধন, তাতে ইষ্ট হবে না। তাহলে এই এক অদ্ভুত ব্যবস্থা কৌতূহলকে সদা জাগ্রৎ রাখ্‌বে। তুমি যেমন চল্‌ছ তেমনি চল্‌বে। আমি তোমাকে শুধু তোমার দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিলাম। এতে তুমি দোষ নিও না। আমার সম্পত্তি অর্থ অগাধ না হলেও প্রচুর ; কিন্তু তবু আমি সুখী নই। কিন্তু কোথায় আমার ব্যথা, কোথায় আমার দুঃখ, কাউকে বিশ্বাস করে বল্‌তে পারিনি। তোমাকে আমি স্নেহ করি, বিশ্বাস করতেও সুরু করেছি। তোমাকে হয় তো একদিন বল্‌ব।

কর্ত্তার কণ্ঠস্বর হঠাৎ ভারী হইয়া আসিল। তিনি ধীরে ধীরে রন্ধন-কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

৯

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর বিভা ও প্রভা শয়নকক্ষে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল।

বিভা বলিল, দিদি এ' নতুন ঠাকুরকে তো ঠাকুর বলে ডাকা যাবে না ; কি বলে ডাকা হবে ?

প্রভা জিজ্ঞাসা করিল, কেন ডাকা যাবে না ?

বিভা সাশ্চর্য্যে বলিল, বাঃ দিদি, এ-ঠাকুর লেখাপড়া জানে, বলে— ম্যাট্রিক পাশ, আমার তো মনে হয় ও অন্ততঃ বি, এ, পাশ। তার ওপর

ও যে রকম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তাতে কোন সন্দেহ থাকে না যে ও খুব বড় ঘরের ছেলে। আরও এর সম্বন্ধে আমার অনেক কথা মনে হয়।

প্রভা। আর কি মনে হয়?

বিভা। এক একবার ভাবি ও হয়তো ডাক্তার।

প্রভা। কেন, ও-কথা তোর মনে হ'ল কেন? কাকে চিকিৎসা করতে দেখ্‌লি?

বিভা। ওর সব কাজের পদ্ধতিতে স্বাস্থ্যতত্ত্বের জ্ঞান পরিপূর্ণ। ও এসে পর্য্যন্ত মাছির একাধিপত্য কমে গেছে। থুথু কারো যেখানে সেখানে ফেলার যো নেই।

প্রভা। তা বটে, আমাকেও সেদিন বল্‌ছিল—বড়দি দেখ্‌বেন তো কেউ যেন মেঝেয় বা উঠানে থুথু ফেলে না। থুথুর জন্য এই চূর্ণভরা পাত্র রইল, ঐখানে ফেল্‌তে হবে।

বিভা। প্রথম দিন-কতক ভারি বেজার লাগ্‌ছিল দিদি। এখন কিন্তু ভেবে দেখে ব্যবস্থাটা ভালই লাগছে। কিন্তু ওকে কি বলে ডাকব বলে দাও না?

প্রভা। মুখুয্যে মশায় বলে ডাকিস্।

বিভা। দিদি যেন কি? মুখুয্যে মশায় তো ভগ্নীপতিকে বল্‌তে হয়। চিরকুমার সভায় অক্ষয়কে বুঝি মনে নেই?

প্রভা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, কি বলিস্ তুই, প্রভা, তার ঠিক নেই।

বিভারও তখন মনে পড়িল কথাটা তেমন ঠিক মত বলা হয় নাই। দিদি তাহার কথায় দুঃখ পাইয়াছে মনে হইবামাত্র তাহার চোখে জল আসিল। মুখ শুকাইয়া গেল। বিরস বদনে বলিল, দিদি আর কখনো এমন কথা বল্‌ব না।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষু হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

প্রভা ভগ্নীর চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল, তোর এত বুদ্ধি এত জ্ঞান, তবু একটা কথার ভার সইতে পারিস্‌নে কেন? কাঁদিস্‌নে, চুপ কর। ঠাকুরকে কি বলে ডাক্‌বি, তার জন্য তোর এত মাথাব্যথা কেন? কিচ্ছু বলে ডাকিস্‌নে।

দিদির আদরে বিভার দুঃখ দূরে গেল। সে অতি মৃদু হাসিয়া বলিল, কিছু বলে না ডাক্‌লে বুঝি চলে? কিছু বলে ডাকবার না থাকলেই তো 'ওগো-হাঁগো' এসে পড়ে।

প্রভা হাসিয়া বলিল, তা না হয় 'ওগো-হাঁগো' বলেই ডাকিস্।

বিভা বলিল, কি যে বল দিদি তুমি! ঠাকুরকে বুঝি লোকে 'ওগো-হাঁগো' বলে ডাকে?

প্রভা দুষ্টামি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহলে কাকে বলে রে?

কাহাকে যে বলে, বিভার হঠাৎ সে কথাটা মনে পড়িল। লজ্জিত হইয়া বলিল, দিদি তুমি কেবল আমাকে ঠকাও!

প্রভা বলিল, না আর ঠকাব না, তুই ওকে নিত্যবাবু বলে ডাকিস্।

বিভা বলিল, তাহলে ও ভাব্‌বে আমি এদের মাইনে খাই বলে ঠাট্টা করছে।

প্রভা হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, তাহলে কি বলি বল্, যা বল্‌ব তাই তুই উকিলের মত জেরায় কেটে দিবি। আমার বিদ্যেতে কি লোকে বুদ্ধি দেওয়া কুলোয়?

বিভা ভয় পাইয়া বলিল, দিদি তোমার পায়ে পড়ি, তুমি গম্ভীর হোয়ো না, তুমি এবার যা বলবে বল, তাই বলেই ডাক্‌ব।

প্রভা হাসিতে গাম্ভীর্য্য ভাসাইয়া দিয়া বলিল, আচ্ছা গম্ভীর হব না। তুই নিত্যদাদা বলে ডাক্‌বি। এবার হয়েছে তো? না আরও কিছু সমালোচনা করবি?

বিভা আর সমালোচনা করিল না। দিদির নির্দ্দেশ মানিয়া লইয়া তাহার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।

প্রভা স্নেহভরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, আচ্ছা বিভা, তোর বয়স হচ্চে, লেখাপড়া শিখছিস, কিন্তু তুই এখনও সেই ছেলেমানুষ রয়ে গিয়েছিস। বয়সের সঙ্গে শিক্ষার সঙ্গে তোর জ্ঞান বাড়ছে কিন্তু বুদ্ধি বাড়ছে না কেন বল্ ত?

বিভা দিদির ডান হাতের একটা আঙ্গুল খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল, বুদ্ধিটা তুমি কম দেখ্‌লে কিসে বলো ত?

প্রভা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তা যদি বুঝবি, তাহলে তুই একথা বল্‌বি কেন? তোকে একটা কড়া কথা বল্‌বার যো নেই, একটু শাসন করতে গেলেই তুই কেঁদে ভাসাবি। আজ বাদে কাল তোর বিয়ে হবে, শ্বশুরবাড়ী চ'লে যাবি: তখন আমি কেবল কেঁদে মরব, আর ভাবব—হয়ত তুই দুঃখ পাচ্চিস্, হয়ত তোকে কেউ বকেছে, তুই কেঁদে ভাসাচ্চিস!

বিভা চুপ করিয়া খানিকটা কি ভাবিল। তারপর উঠিয়া বসিল। দিদির মুখপানে খানিকটা একদৃষ্টে চাহিয়া জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

প্রভা 'ষাট্' বলিয়া বিভার চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়া বলিল, নিশ্বাস ফেল্লি কেন রে? গম্ভীর হলিই বা কেন?

বিভার মুখের হাসি তখন মিলাইয়া গিয়াছে। সে ম্লান মুখে বলিল, দিদি, একটা কথা আমার এতদিন একটিবারও মনে হয়নি। আজ হঠাৎ মনে হ'ল। কিন্তু কি করে যে এতদিন অতবড় কথাটা ভুলে ছিলাম, তাই ভেবে আজ অবাক হচ্চি।

প্রভা বিস্মিত হইয়া বলিল, তুই যে হঠাৎ বিভা খুব বিজ্ঞের মত কথা কইতে শিখে গেলি দেখছি! আর তো তোকে বুদ্ধি নেই বলতে

পারব না। কিন্তু কি তোর সে অদ্ভুত কথাটা, তাতো শুনতে পেলাম না ?

বিভা বলিল, দেখ দিদি, মানুষ এত স্বার্থপর যে, সে নিজের ছোট স্বার্থের কাছে অপরের প্রকাণ্ড স্বার্থও একেবারে ভুলে যায়। আমি জ্ঞান হয়ে অবধি তোমাকে দেখছি, তোমার যত্নে কোলে বড় হয়েছি, তাই সব সময়ে তোমাকে চেয়েছি। ছোট বেলায় না হয় কোন কথা ছিল না। কিন্তু এখনও সে অভ্যাস গেল না। তোমাকে একটুখানি না দেখতে পেলে রক্ষে নেই, খাবার সময় তুমি কাছে না থাকলে কিছুতে খাব না। ভাবি, কেন তুমি থাকবে না! আমি যাব স্কুল-কলেজে, তুমি ঘরে বসে বসে আমার জন্য সব গুছিয়ে রাখবে, নইলে আমি এসে অনর্থ বাধাব। কিন্তু একবারও ভাবিনে তুমি কি নিয়ে আছ, তোমার কি সুখে কিসের মোহে দিন কাটছে! এত হীন—এত স্বার্থপর আমি!

প্রভা বিভার চোখ-মুখের পানে চাহিয়া চমকিত হইল। যাহাকে এক মুহূর্ত্তে সে ছেলেমানুষ বলিয়া স্নেহের অনুযোগ করিয়াছে, হঠাৎ মুহূর্ত্তের মধ্যে সে কি করিয়া এমন গুরু-গম্ভীর হইয়া উঠিল ?

প্রভা তাহার বিস্ময় দমন করিয়া কহিল, তুই থাম দিকি বিভা, তোর অত পাকামিতে কাজ নেই।

বিভা তেমনি উদাস-করুণ কণ্ঠে কহিতে লাগিল, তোমার অগাধ স্নেহ পেয়ে এ-কথাটা জেনেও ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমারি জন্য তুমি স্বামীর ঘর করতে পেলে না, আমারি জন্য তাঁর সঙ্গে তোমার বিচ্ছেদ হয়ে গেল। নইলে তোমার মত সুন্দরী গুণবতী স্ত্রী যাঁর, তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন? আমার জন্য তুমি তোমার সুখ-শান্তি সব বিসর্জ্জন দিয়েছ; আমি লক্ষীছাড়ী তোমার রাহু, তোমার সব গ্রাস করেছি।

এতক্ষণে প্রভা বিভার মনোভাব বুঝিয়া ব্যথায় আতঙ্কে শিহরিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আজ তোর মুখে এসব কথা কে দিলে বিভা? আমার যে কথা মনে হয় না, তুই সে কথা ভাবতে যাবি কিসের জন্য?

বিভা বলিল, কেন ভাববো না দিদি? এ কথা যে এত দিন ভাবিনি এই আশ্চর্য্য। কি কষ্ট তুমি আমার জন্য সয়েছ, তাই আজ ভেবে সত্যি দিদি আমি অবাক হচ্চি। লোকে স্বামীর জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে, তুমি এই হতভাগী বোনের জন্য সর্ব্বস্বের চেয়েও বেশী—স্বামীকে ছেড়েছ! আর না চাইতে তোমার কাছ থেকে এতখানি পেয়েছি, তুমি আমার জন্য আপনা হতে এতখানি ত্যাগ করেছ, সেজন্য তার দাম বুঝতে পারিনি! নিজের সুখের কথাই চিরদিন ভেবেছি, তোমার কথাটা একটা দিনের জন্যও মনে পড়েনি!

বলিতে বলিতে বিভা কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রভা সস্নেহে বিভার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিল, এতদিন পরে এ সব কথা কেন বিভা? তুই কি আমাকে কোন দিন বলেছিলি যে 'দিদি তুমি শ্বশুরবাড়ী যেতে পাবে না?' যে তার জন্য তোর অনুতাপ হচ্চে? আমার কর্ত্তব্য ছিল তোকে অসহায় ফেলে না যাওয়া—তাই যাইনি, আমার অদৃষ্টে স্বামীর ঘর করা নেই—তুই কি করবি? আর তাঁকেও বিয়ে করার জন্যে দোষ দিতে পারিনে। অভিমানের বশে, রাগের বশে, মানুষ কত গর্হিত কাজ করে ফেলে; যেগুলো ফেরানো যায় ফেরে, যে কাজ ফেরাবার নয় তা থেকেই যায়। তার তুই কি করবি, তিনি কি করবেন, আমিই বা কি কোর্‌বো?

বলিয়া প্রভা স্নেহভরে বিভার মুখচুম্বন করিল। বিভা দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়া খানিকটা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া তবে শান্ত হইল।

১০

সে অনেক দিনের কথা। সূর্য্যপ্রকাশের স্ত্রী রত্নমালা যখন মৃত্যুশয্যায়, সূর্য্যপ্রকাশ ভাগ্য-দোষে তখন বিদেশে। বারো বৎসরের প্রভার হাতে তিন বৎসরের বিভাকে রাখিয়া স্বামীর আগমনের আশায় কিছুক্ষণ থাকিয়া, তিনি চিরতরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। রত্নমালার শেষ কথা এই—মা, এত লোক-জন এত আত্মীয় কিন্তু তিনি কাছে না থাকায় যাবার দিন আমি নিতান্তই একা। তাই ভরসা করে আর কারো হাতে বিভাকে না দিয়ে তোরই হাতে দিয়ে গেলাম, তিনি এলে তুই এ কথাটি তাঁকে বলে বিভাকে তাঁর কাছে দিবি।

প্রভা সে কথা ভোলে নাই।

সূর্য্যপ্রকাশ যে স্ত্রীকে শেষ দেখা দেখিতে পান নাই, সে ব্যথা আজিও তাঁহার অন্তরে জাগিয়া আছে। আর সেই হইতে বহু কাজের লোক হইয়াও সব কাজ ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছেন।

রত্নমালার মৃত্যুর একটি ছোট ইতিহাস ছিল। বাল্যাবধি রত্নমালার ফুস্‌ফুস্ দুর্ব্বল ছিল। বিখ্যাত জমিদার-বংশে বিবাহ হইবার পর হইতে তাহা ধীরে ধীরে বাড়িয়াই চলিয়াছিল। প্রকাণ্ড চক্‌মিলান অট্টালিকার অন্তঃপুরে বাহিরের বিশাল প্রাচীর ভেদ করিয়া যেটুকু বাতাস ও আলোকের আসিবার অধিকার ছিল, তাহা তাঁহার পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিল না। ডাক্তার পরামর্শ দিয়াছিলেন ইঁহাকে বাহিরের অংশে যেখানে প্রচুর আলোক-বাতাস আছে, সেইখানে রাখা বিশেষ প্রয়োজন। তখন সূর্য্যপ্রকাশের পিতা বিশ্বপ্রকাশ জীবিত। বহুবিধ গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি

অতিরিক্ত মাত্রায় রক্ষণশীল ছিলেন। তাঁহার বিশেষ বিধান ছিল, অন্দরে কোন পুরুষ ভৃত্য পর্য্যন্ত যাইতে পারিবে না। পুরুষ আত্মীয়-স্বজন আসিলে তাঁহাদের বাহিরে থাকাই বিধি ছিল। যেমন পুরুষের ভিতরে যাওয়া নিষেধ ছিল তেমনি নারীদেরও বাহিরে আসা বা পুরুষ আত্মীয়বর্গ, পথিক ও ভৃত্যের চক্ষুগোচর হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। স্বর্গীয় বিশ্বপ্রকাশ তাঁহার পুত্রবধূর জন্য মনুষ্য-নির্ম্মিত সমস্ত সুখ-সুবিধা সম্পদ ও সৌন্দর্য্য দিয়া পুত্রবধূকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের দান আলোক ও বাতাসের অধিকতর সুব্যবস্থা করিতে পারিলেন না।

পিতার মৃত্যুর পর অধিকতর রক্ষণশীলা মায়ের মুখ চাহিয়া সূর্য্যপ্রকাশ কিছু প্রতিকার করিতে পারিলেন না; তদুপরি জিনিষটা অনেকটা সহিয়া গিয়াছিল, উহার ভয়ানকত্বও অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। শাশুড়ীর মৃত্যু হইলে রত্নমালাই সংসারের কর্ত্রী হইলেন। তাঁহার আর বাহিরে যাইবার অবকাশ ঘটিল না। ক্রমশঃ সূর্য্যপ্রকাশ স্ত্রীকে বাহিরে লইয়া যাইবার কথা একপ্রকার ভুলিয়াই গেলেন।

সেই কথা অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল যখন তিনি স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

মাতৃহীনা দুই কন্যাকে সাশ্রুনেত্রে বুকে তুলিয়া লইলেন। একজন সংসারের কিছুই জানে না, অপরে সবে মাত্র সংসারের সুখ-দুঃখ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে।

প্রভা পিতাকে বলিল, বাবা, মা তোমাকে দেখ্‌বার জন্য সারারাত্রি ছট্‌ফট্ করেছিলেন। শেষে যখন তুমি এলে না, শেষরাত্রে আমাকে গুটি-কয়েক কথা বলে গেছেন তোমাকে বল্‌তে।

সূর্য্যপ্রকাশ বলিলেন, কি কথা মা, বল। প্রভা বলিয়াছিল, 'মা বলেছিলেন বাড়ীর ভিতর থেকে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। এত

বড় অন্দর-মহলে, এত সুখ-সুবিধে, তবু মনে হ'ত যেন বাতাস-অভাবে আমি হাঁপিয়ে উঠ্‌চি। তিনি এলে বলিস্ যেন তোদের তিনি বছরে অন্ততঃ বার কতক বাহিরে অন্য কোথায় নিয়ে যান্ আর তোদের যেন ভাল করে লেখাপড়া শেখান।

সে দিন সূর্য্যপ্রকাশের অতি কঠিন দিন গিয়াছিল। সারাদিন সারারাত্রি সূর্য্যপ্রকাশ রত্নমালার আত্মার তৃপ্তির জন্য কি করিবেন সেই চিন্তায় কাটাইয়াছিলেন। সঙ্কল্পও স্থির হইয়া গিয়াছিল। রত্ন-মালার শ্রাদ্ধের পরই তিনি কলিকাতায় আসিয়া মুক্ত স্থান দেখিয়া একটি বাড়ী ক্রয় করিলেন ও তাহাতে সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থা করিয়া মেয়েদের লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। বাড়ীর ভিতর ধীরে ধীরে উদ্যান রচনা করিলেন। মেয়েদের ইচ্ছামত বাড়ীর বহিরংশে ও উদ্যানে বেড়াইবার অনুমতি দিলেন। মাঝে মাঝে তাহাদের লইয়া স্বয়ং বেড়াইতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে মেয়েদের স্বাস্থ্যের ও শিক্ষার উন্নতি হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে দরকার হইলে দেশ হইতে বৃদ্ধ ম্যানেজার আসিয়া কলিকাতা থাকিতেন ও সূর্য্যপ্রকাশ সেই সময়ে দেশে ঘুরিয়া আসিতেন।

প্রভার বিবাহ হইল ১৬ বৎসর বয়সে, তখন বিভার বয়স ৭ বৎসর। সুশিক্ষিত যুবক ভূম্যধিকারী সঞ্জীবচন্দ্রের সহিত প্রভার বিবাহ হইল। বিবাহের পরদিন শ্বশুর-গৃহে যাত্রার সময় প্রভা কাঁদিয়া অস্থির—কেমন করিয়া সে বিভাকে একা ফেলিয়া যাইবে! বিভাকে সঙ্গে পাঠানো অনেকের মত হইল না। কাজেই প্রভাকে একাই যাইতে হইল। বিভাকে ছাড়িয়া যৌবন-স্বপ্নের সমস্ত আনন্দ প্রভার কাছে ম্লান হইয়া আসিল। ফুলশয্যার রাত্রেও বিভার ম্লান মুখ ও অশ্রুজলের স্মৃতি তাহার অর্দ্ধেক আনন্দ হরিয়া লইয়াছিল।

সঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, বাপের বাড়ী থেকে আসবার সময় না হয় অনেকে কাঁদে, কিন্তু এখানে এসে তো পাঁচ রকমে ভুলে থাকা উচিত। তা এখানে এসেও তুমি মাঝে মাঝে কাঁদছ দেখছি। এখানে কি তোমার কষ্ট হচ্ছে?

প্রভা উত্তর দিল যে, বিভার জন্য তার মন কেমন করিতেছে! এবং কেন যে মন কেমন করিতেছে, তার কারণস্বরূপ সে তাহার মাতার মৃত্যু-সময়কার কথা বলিল। সঞ্জীব সহৃদয় যুবক; সব শুনিয়া সস্নেহে বলিল, তাকে সাথে করে আন্‌লেই তো বেশ হ'ত। তাহলে তোমারও মন বস্‌ত, সেও তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকত। আবার যখন আস্‌বে তাকে নিয়ে এস।

প্রভা বলিয়াছিল, বাবা যদি পাঠান আন্‌বো।

ইহার পর কয়েকদিন পরে সঞ্জীব শ্বশুরের অনুরোধে প্রভাকে লইয়া শ্বশুরালয়ে গেল এবং সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া বাড়ী ফিরিল।

মাস কয়েক পরে শ্বশুরের নিমন্ত্রণে ও অনুরোধে সঞ্জীব একবার শ্বশুরালয়ে আসিল; তখন তাহারা সব কলিকাতায়। প্রভার তখন সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছে। সঞ্জীব বলিল, এবার তোমাকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করি।

স্বামীর সঙ্গে প্রভার যাইবার ইচ্ছা করিতেছিল। কিন্তু বিভাকে ছাড়িয়া সে কি করিয়া যাইবে! সেই বিবাহের সময়ে তাহাকে কয়দিন না দেখিয়া বিভার কি অবস্থাই হইয়াছিল! দীর্ঘকাল অদর্শনে না জানি কি হইবে! মুখে কিন্তু সে-কথা বলিতে পারিল না! মুখে বলিল, তোমার ইচ্ছা।

স্বামী বলিল, আমার ইচ্ছা—তোমার কোন ইচ্ছা নেই?

প্রভা লজ্জা পাইয়া বলিল, ইচ্ছা নেই সে কথা কি বলছি?

স্বামী উত্তর করিল, ইচ্ছা আছে সে কথাও তো বলছ না।

'তাই বুঝি বলে' বলিয়া প্রভা মুখ নীচু করিল।

সঞ্জীব বলিল, বলে না, কিন্তু ভাবেও তো। তুমি যে তাও ভাব না।

প্রভা বলিল, আমি ভাবিনে, তুমি কি করে জানলে?

তাহার কণ্ঠে ব্যথার সুর।

সঞ্জীব অনুতপ্ত হইল। বলিল, না, না, তুমি ভাব বৈকি। আমি এমন হঠাৎ নিয়ে যাবার কথা তুলব না—যদিও আমি তোমাকে আজই নিয়ে যেতে পারলে সুখী হতাম। তুমি এতদিন এখানে ফুটেছিলে; এখান থেকে তোমাকে তুলে নেবার আগে আমি খবর দেব, সময় দেব,—তারপর নিয়ে যাব। একেবারে নিষ্ঠুরের মত ছিঁড়ে নিয়ে যাব না।

প্রভার ব্যথা ঘুচিল। বলিল, কি যে বল তুমি! বড় দুষ্ট তুমি; ভারি গুছিয়ে কথা বল।

কয়েক দিন থাকিয়া সঞ্জীব চলিয়া গেল।

বিবাহের ঠিক এক বৎসর পরে দিন-স্থির করিয়া সঞ্জীবের মায়ের জবানী পত্র আসিল, অমুক দিন যেন বধূমাতাকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

কয়েক দিন পরে সূর্য্যপ্রকাশের পত্র গেল, কয়েক দিন প্রভার জর হইয়াছে, দিনটির যেন পরিবর্ত্তন করা হয়।

দিন পরিবর্ত্তন করা হইল। দুই মাস পরে আবার দিন স্থির হইল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সঞ্জীব আসিল। যাইবার সবই স্থির। আগের রাত্রে বিভার হঠাৎ জর হইল। কাঁদিয়া কাঁদিয়াই বোধ হয় জরটা হইয়াছিল; প্রভা বড়ই বিপদে পড়িল। জর যদি বাড়িয়া যায়? সে চলিয়া গেলে বিভা দিন-রাত কাঁদিয়া যদি অসুখ কঠিন করিয়া তোলে? কল্পনায় প্রভা দেখিল—বিভার গা আগুনের মত গরম, মাথায় বরফ, পাশে ডাক্তার, সে ভুল বকিতেছে ও দিদি দিদি করিয়া ডাকিতেছে।

প্রভার চক্ষু দিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সঞ্জীব জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কাঁদছ কেন, যেতে হবে বলে ?

প্রভা উত্তর করিল, তার জন্য নয়। যাবার সময় বিভার জর হ'ল তাই।

সঞ্জীব সান্ত্বনা দিয়া বলিল, ও কিছু নয়, সেরে যাবে।

প্রভা বলিল, ওর অসুখ হলে আমার বড় ভয় হয়। কেমন যেন হয়ে যাই !

সঞ্জীব ভরসা দিয়া বলিল, এ অবস্থায় ভয় নেই কিছু, অমন কত অসুখ হয় ! এমনি সেরে যাবে।

প্রভা খানিক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, অসুখটা সেরে গেলে যদি নিয়ে যাও, মা কি বড্ড রাগ করেন ?

সঞ্জীব ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল, তা আমি কি করে বলব ?

প্রভা আবার জিজ্ঞাসা করিল, তুমি রাগ কর ?

সঞ্জীব বলিল, বোধ হয় করি।

প্রভার নিশ্বাস একটু জোরে পড়িল। সঞ্জীব তাহা লক্ষ্য করিল। একটু ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা আমি যদি বলি যাওয়া সম্বন্ধে তোমার যা ইচ্ছা তাই কর, তাহলে তুমি কি কর ? কালই যাও, না সময় চাও ?

প্রভা ধীরে ধীরে বলিল, একটু সময় চাই।

সঞ্জীব ক্ষুণ্ণ হইল। স্বামী ছাড়া আর কারুর উপর স্ত্রীর বেশী টান কয়জন স্বামী সহিতে পারে ?

প্রভা আবার জিজ্ঞাসা করিল, রাগ করলে ?

সঞ্জীব বলিল, রাগ কিসের ?...বাকি রাতটুকু অভিমানে কাটিয়া গেল। সকালে প্রভার ম্লান মুখ দেখিয়া সঞ্জীবের মায়া হইল। সে-ই চেষ্টা করিয়া সন্ধি করিল। সঞ্জীব সেবারেও প্রভাকে রাখিয়া গেল।

বাড়ী ফিরিয়া কিন্তু মায়ের কাছে বড়ই তিরস্কৃত হইল। মা বলিলেন, তোমার বংশের উপযুক্ত কাজ কর নাই।

বড় কঠিন তিরস্কার।

মাস কয়েক এমনি করিয়া কাটিয়া গেল। সঞ্জীব কার্য্যগতিকে ইচ্ছা করিয়া প্রভাকে রাখিলেও মায়ের তিরস্কারে অভিমানের সঙ্গে অপমান বোধ করিল। প্রভার খান-দুয়েক চিঠি আসিলেও সে কোন উত্তর দিল না। ছয় মাস পরে মায়ের আদেশ হইল, বৌমাকে আনার জন্য একখানা চিঠি লিখে দাও। আগামী সোমবার আনতে হবে। এ-বার যেন অপমান স'য়ে ফিরে এসো না।

সোমবারের এখন চার দিন দেরী ছিল। পত্র লিখিয়া দেওয়া হইল এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সঞ্জীব রবিবারের দিন সেখানে পৌঁছিল। গিয়া দেখিল, বিভার কয়েকদিন হইতে টাইফয়েড জর। সকলেই একটু উদ্বিগ্ন ও চিন্তান্বিত।

এবার সঞ্জীব আর কোন চক্ষু-লজ্জা করিল না। বলিল, মা বিশেষ করে বলেছেন নিয়ে যেতে; এবার নিয়ে যেতেই হবে।

সূর্য্যপ্রকাশ আপত্তি করিলেন না: কারণ জামাতাকে আর কতবার ফিরাইবেন? প্রভা বাঁকিয়া বসিল। বলিল, এ অবস্থায় আমি ওকে রেখে কি করে যাব?

সূর্য্যপ্রকাশ বলিলেন, কি করবে মা! বেয়ান যখন অমন করে বলেছেন তখন যেতেই হবে। কতবার এসে সঞ্জীব ফিরে গেছে, তাকেই বা দোষ কি করে দেব? তুমি এবার আর কোন আপত্তির কথা তুল' না মা!

প্রভা বলিল, তা বলে বিভাকে এ অবস্থায় কি করে রেখে যাব বাবা?

সূর্য্যপ্রকাশ বলিলেন, কি করবে মা! যেতেই হবে।

রাত্রে সঞ্জীবের কাছে মিনতি করিয়া প্রভা বলিল, বারংবার মুখ নেই।

তবু তোমায় বল্‌ছি, এই শেষবার আমায় দয়া করে রেখে যাও। আর কখনো তোমাকে এ অনুরোধ করবো না।

সঞ্জীবের মায়ের আদেশ মনে ছিল; তাঁহার সেবারকার তীক্ষ্ণ উক্তিও সে ভুলে নাই। তদুপরি বারবার এভাবের আপত্তিতে সে বিরক্তও হইয়াছিল। বলিল, এবার না গেলে তোমার আর যাবার দরকারও হবে না। মা সে ব্যবস্থা করবেন।

শেষের কথাটা হঠাৎ অতর্কিত ভাবে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল।

প্রভার মনও এ কথায় কঠিন হইয়া উঠিল। সেও বলিয়া ফেলিল, বেশ তাই যেন করেন!

ইহাতে সব কথার মীমাংসা হইয়া গেল। সঞ্জীব সেই রাত্রেই উঠিয়া চলিয়া গেল। সকালে জানিতে পারিয়া সূর্য্যপ্রকাশ প্রভাকে অনুযোগ করিলেন, কিন্তু তখন আর তাহাতে কোন ফল নাই। অনিষ্ট যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে।

সেই হইতে প্রভা কলিকাতাতে পিতার কাছেই আছে।

ইহার কয়েক বৎসর পরে একটি সংবাদ শোনা গিয়াছিল যে, সঞ্জীব পুনরায় বিবাহ করিয়াছে। সংবাদটি সত্য কি না তাহা অনুসন্ধান করিবার সাহস বা ইচ্ছা সূর্য্যপ্রকাশের হয় নাই।

প্রথমে লজ্জায় প্রভা সঞ্জীবকে পত্র লিখিতে পারে নাই। পরে এ গুজব যখন তাহার কানে উঠিল, সে গোপনে কাঁদিয়া ভাসাইল; কিন্তু পত্র লিখিবার ইচ্ছা আর রহিল না।

ইহাই প্রভার পূর্ব্ব ইতিহাস।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতে সূর্য্যপ্রকাশ সংসারে অনেকটা উদাসীন হইয়াছিলেন। প্রভার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে সেই ঔদাসীন্য আরও বাড়িয়া গিয়াছিল।

সংসারের কোন খোঁজই বড় একটা রাখিতেন না। এক-একবার এক-একটা অদ্ভুত খেয়াল লইয়া থাকিতেন।

১১

উমার দিন বড়ই দুঃখে কাটিতেছিল। দুঃখ প্রকাশের তাহার উপায় ছিল না। পিতাকে দেখিলে, ভ্রাতার সঙ্গে কথা কহিতে গেলে তাহাকে ম্লান মুখ প্রফুল্ল করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে হয়। নইলে পিতার ব্যবহারে ক্ষোভ দেখান হয়, ভ্রাতার আচরণের প্রতিবাদ করিতে হয়। মা যখন দুঃখ করেন, চোখে জল আসে। অরুণাকে কখন কখন কোন কথা বলিতে যায়, কিন্তু বলিতে বলিতে অর্দ্ধপথে কথা বাধিয়া যায়। ভাবে হয়ত অরুণা দুঃখ পাইবে। অরুণা বুঝিতে পারে। ম্লান মুখে নিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্য কথা পাড়ে।

উমা যখন একা থাকে, তখন একটু শান্তি পায়। শুধু স্বামীর স্মৃতিকে সাথী করিয়া যতটুকু সময় সে থাকিতে পায়—সেইটুকুই তার দুর্লভ সময়। কোন্ দিন স্বামী কি ভালবাসার কথা বলিয়াছিলেন, কোন্ দিন তাহাকে হাতে ধরিয়া কাছে বসাইয়াছিলেন, কোন্ দিন তাহাকে স্বামী-নির্ব্বাচনের প্রসঙ্গ তুলিয়া মধুর লজ্জায় ফেলিয়াছিলেন—সেই সব কথা আপন মনে ভাবিতে ভাবিতে তাহার দুঃখের সরোবরে আনন্দের কমল ফুটিয়া উঠিত। স্বামীর কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার দুটি চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত। নিরালায় খানিকক্ষণ অশ্রু ফেলিয়া তবে সে শান্তি পাইত। ভাবিত, আজ তাহার ঠাকুমা থাকিলে এমন ঘটিতে পারিত না। যেমন করিয়া হউক তিনি ইহার সুব্যবস্থা করিতেন, তাহার দাদার সঙ্গে স্বামীর এমন সংঘর্ষ বাধিত না। পিতা এমন অপ্রসন্ন হইতে পারিতেন না। কি তাঁহার দোষ? না, তিনি অন্যায় সহিতে পারেন নাই। তিনি

ভয় করেন নাই, বেশ করিয়াছেন। ঐশ্বর্য্যের লোভে সত্যকে পরিত্যাগ করেন নাই, উপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু অমন করিয়া তাহাকে না জানাইয়া চলিয়া গেলেন কেন? তাহাকে একবার ডাকিলেন না কেন? যদি সে সুখের মোহে ঐশ্বর্য্যের লোভে এখানে পড়িয়া থাকিতে চাহিত, তাহা হইলে তিনি তো চলিয়া যাইতে পারিতেন। তাহাকে একটিবারও না বলিয়া তাঁহাকে অনুগমন করিবার একটিবারও সুযোগ না দিয়া, কেন তিনি চলিয়া গেলেন? স্বামীর সঙ্গে বনে বাস করিয়াও তাহার যে সুখ, তাহা তিনি জানিয়াও কেন তাহাকে সঙ্গে নিলেন না?

ইহার জন্য তো তাহাদের ঐশ্বর্য্যের কোন প্রয়োজন নাই। নাই বা তাহারা সম্পত্তি পাইল, নাই বা অর্থ হাতে আসিল, তিনি যে বিদ্যার অধিকারী তাই তাদের তিনজনের পক্ষে যথেষ্ট।

উমার মনে পড়িত সত্যব্রতকে দেখাইয়া ঐ ছেলেটি সব চেয়ে ভাল বলায় ২।১ জন অন্তঃপুরিকা পরিহাস করায়, তাহার পিতামহী গর্ব্ব ও প্রসন্নতার সহিত বলিয়াছিলেন—সাবিত্রী সত্যবানকে স্বামীরূপে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, উমা মহাদেবকে পাইবার জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন: আমাদের উমা কেন তাহা করিবে না?

উমার মনে পড়িত, প্রথমে সে সকলের সম্মুখে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিত, পিতামহীর আদেশ পাইয়া কখন কখন তাঁহাকে ডাকিয়া আনিত। তাহার ঐ বিষয়ে কোনই সঙ্কোচ আসিত না; তাহার স্বামীর উহাতে সঙ্কোচ দেখিয়া সে বরং একটু বিস্মিত হইত। তারপর ধীরে ধীরে কোন্ দিক দিয়া সঙ্কোচ দেখা দিল, লজ্জা আসিয়া দুজনের মধ্যে মিষ্ট আড়াল রচনা করিয়া দিল—তাহা তাহার বিগত দিনের এক সুমধুর স্মৃতি। কলিকাতায় স্বামীর কৃতিত্ব, তাঁহার অর্জ্জিত অগাধ জ্ঞান ও বিদ্যা তাহাকে বিপুল গৌরব দান করিয়াছিল। সেই সব কথা উমা ভাবিত আর

অশ্রুজলে ভাসিত। যখন দুঃখ বড় গভীর ও অসহ্য হইত, তখন স্বামীর সযত্ন-রক্ষিত চিঠিগুলি বাহির করিয়া নিভৃতে তাহা পড়িত এবং বহুবার পঠিত পত্রগুলির স্থানে স্থানে অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিত।

অরুণা দেখিত ও বুঝিত। উমার দুঃখে তাহার হৃদয় বেদনার্দ্র হইয়া উঠিত। তাহার স্বামীই একপ্রকার উমার এই দুঃখের কারণ, ইহা মনে করিয়া এক এক সময়ে আপনাকে অপরাধিনী মনে করিত।

একরাত্রে সে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর-জামাইয়ের কোন সংবাদ পাওয়া গেল ?

বিজয় বলিল, এখনও তো কিছুই খবর পাওয়া যায় নি।

"কোনও খবর নয় ?"

"দেওয়ান মশায় একবার গিয়ে ফিরে এসেছেন, আবার গেছেন। তিনি ফিরে না এলে নিশ্চিত কিছু বোঝা যাচ্ছে না।"

"আমি একটি কথা বল্‌ব ?"

"অনুমতি নিয়ে কথা জিজ্ঞাসা করার যুগ তো আর নেই! এখন কি কথা স্বচ্ছন্দে বল্‌তে পার।"

"তুমি কেন একবার গিয়ে একটু খোঁজ কর না ?"

"কত জায়গায় লোক গেছে, দেওয়ান মশায় নিজে এই বিষয়ে লেগে রয়েছেন। আমি গেলে আর বেশী কি করতে পারব ?"

"না পারলেও তোমার একটু চেষ্টা তো করা হবে ?"

"তুমি এ কথা কেন বল্‌ছ ? কেউ কি এ সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলেছে ?"

"না, কেউ কিছু বলেনি। কিন্তু তোমার সঙ্গে ঠাকুর-জামাইয়ের বচসা হওয়াই এর মূল, সে জন্য ঠাকুরঝির কাছে আমি সময়ে সময়ে বড় কুণ্ঠিত

হয়ে পড়ি। সে অবশ্য মুখ ফুটে কিছু আজ পর্য্যন্ত বলেনি, কিন্তু এমনি কাতর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দেখ্‌লে বড় মায়া হয়। তুমি একটু ও-সম্বন্ধে চেষ্টা করলে, ওর মনেও একটা ভরসা ও শান্তি আস্‌বে। নয় কি ?"

"এ কথাটা আমারও ক'দিন থেকে মনে হয়েছে। সেদিন সন্ধ্যায় উমা বারান্দার এককোণে সজল চোখে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌তেই ম্লান মুখে সেখান থেকে সরে গেল। তখনি তোমার এই কথাটা আমার মনে হ'ল। সত্যি, আমার জন্য উমার কোন ক্ষতি হবে আমি কোন দিন এ কথা ভাবিনি। আর সত্যিই কোন ক্ষতি হবে ভেবে ত আমি কিছু করিনি। বাবা যে আমার কথা শুনে চট্‌ করে কিছু করবেন, তা আমি বুঝতে পারি নি। পারলে হয়ত সত্যের সঙ্গেই একটা রফা করে ফেলতাম। পরের একটি ভাল-মন্দ নিয়ে নিজেদের এতবড় একটা ক্ষতি হতে দিতাম না।"

"এখন যা হয়ে গিয়েছে তা ত আর ফিরবে না। এখন যা করা যেতে পারে, তারই একটু চেষ্টা তুমি কর। তাহলে ঠাকুরঝির মনে এর জন্য যদি কিছু ক্ষোভ থাকে ত দূর হবে।"

"ঠিক কথা। আমি বাবাকে একবার জিজ্ঞাসা করে যাব।"

অরুণা ইহাতে মনে মনে বড়ই সন্তুষ্ট হইল। স্বামীর সঙ্গে সত্যব্রতের প্রথমে সামান্য বচসা হইয়াছিল এবং তাহারই ফলে উমাকে এতখানি দুঃখ সহিতে হইতেছে ইহা মনে করিয়া সে শান্তি পাইতেছিল না। এবার সে মনে অনেক শান্তি পাইবে।

ইহার দুই দিন পরে পিতার অনুমতি লইয়া বিজয় সত্যব্রতের সন্ধানে বাহির হইল।

অরুণা দেবদেবীর কাছে মানত করিতে লাগিল যেন তাহার স্বামী সত্যব্রতের সন্ধান লইয়া আসিতে কিংবা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে

পারেন। ইহাতে যে তাহার স্বামীর শ্রম দূর হইবে এই চিন্তায় সে বড়ই তৃপ্তি পাইল।

১২

দুপুরে কাজ-কর্ম্ম সারিয়া নিত্যধন কক্ষের দুয়ার বন্ধ করিয়া থাকিত। বলিত, খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম না করিলে তাহার চলে না। ঘণ্টা দুই পরে সে দুয়ার খুলিয়া আপন কর্ম্মে রত হইত। রাত্রে ১০টার পর তাহার বিশ্রাম।

আজ কলেজের ছুটি। আহারাদি শেষ হইয়া গিয়াছে। বেলা বারটা বাজিয়াছে। নিত্যধনের কক্ষদ্বার নিয়মমত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সূর্য্য-প্রকাশ আপনার কক্ষে পাঠমগ্ন বা নিদ্রামগ্ন। বিভার উপন্যাস পড়া শুনিতে শুনিতে প্রভা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে; বিভা ডাকিতে, বলিয়াছে, লক্ষ্মীটি এখন একটু ঘুমুতে দে। আবার রাত্রে শুনব'খন। তুইও ততক্ষণ ঘুমো, নয়ত তোর পড়ার বই পড়্। তারপর বিভা যে তাহার কোন্ উপদেশ গ্রহণ করিল, তাহা জানিবার পূর্ব্বে প্রভা গভীর নিদ্রামগ্ন হইয়াছিল।

বিভা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া নিত্যধনের ঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দুয়ারে কাণ পাতিয়া শুনিল, কোন শব্দ শুনা যায় কিনা। কিছুই শুনিতে পাইল না। কিন্তু দ্বারে একটি নাতিক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল। তাহা দিয়া বিভা দেখিল, কক্ষমধ্যে বাহিরের দিকের জানালা খোলা এবং মেঝের উপর নিত্যধন একটা পাটির উপর বসিয়া একখানা মোটা বইয়ের

মধ্যে ডুবিয়া আছে। বিভা কিছুক্ষণ দুয়ারের ছিদ্রে চক্ষু রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। নিত্যধন একটিবারের জন্যও বই হইতে মাথা তুলিল না। বিভা একবার ভাবিল ফিরিয়া যায়। পরক্ষণে মনে করিল, এইরূপ ভাবে ফিরিয়া গেলে তো প্রত্যেক ছুটির দিন ফুরাইয়া যাইবে। যাহা সে বলিতে চায়, তাহা আর কোন দিন বলা হইবে না। এইবার সে মনে শক্তিসঞ্চয় করিয়া ডাকিল, নিত্যদা!...কোন উত্তর নাই। দেখিল সে তেমনি ভাবে পড়িয়া যাইতেছে। এবার একটু উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল—সেবারও কোন ফল হইল না। তৃতীয় বার ডাকিতে নিত্যধন বই হইতে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে?

বিভা বলিল, আমি বিভা। ঘুমুচ্ছেন?

নিত্যধন বলিল, না, কোন দরকার আছে?

বিভা বলিল; হ্যাঁ আছে একটু। দুয়ারটা একটু খুলুন না।

বিভা ছিদ্র দিয়া দেখিল, নিত্যধন বইখানি বন্ধ করিয়া নিজের বিছানার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া দিল। তারপর ধীরে ধীরে আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

বিভা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কক্ষের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। কক্ষমধ্যে কোন সাজসজ্জা নাই, কিন্তু যাহা কিছু সামান্য দ্রব্যাদি আছে তাহা এমন ভাবে যথাস্থানে রক্ষিত যে, তাহাতেই কক্ষের শ্রী বাড়িয়া গিয়াছে। কক্ষের সর্ব্বত্র এমন ভাবে সুপরিষ্কৃত যে, দেখিলেই মনে হয় এইমাত্র কে কক্ষের সর্ব্বত্র ধুইয়া মুছিয়া রাখিয়াছে!

বিভার মুখ হইতে আপনা হইতে বাহির হইল—বাঃ, আপনার ঘরখানি তো সুন্দর করে রেখেছেন!

নিত্যধন বলিল, কই বিশেষ সুন্দর তো নয়। কি-ই-বা আছে আমার, যে তাই দিয়ে সুন্দর করব?

বিভা বলিল, কিছু নেই, তবু আপনি ঘরখানি সাজিয়ে রেখেছেন—এই হচ্ছে আপনার গৌরব। যাক্ সে কথা। আপনি এখনি বলে বস্‌বেন —আপনার কি দরকার সে কথা তো বল্‌লেন না! কাজেই আপনার সেই বিভীষণ প্রশ্নটা আস্‌বার আগেই আমি কথাটা বলে ফেলি।

নিত্যধন ঈষৎ ম্লান হাসিয়া বলিল, বলুন।

বিভা। আমি একটা কারণে বড়ই মনঃকষ্টে আছি। আপনি যদি কোন প্রতিকার করতে পারেন তাই ভেবে আপনার কাছে এসেছি।

নিত্য। আমি আপনাদের বেতনভোগী ভৃত্য—আপনি সে কথা ভুলে যাবেন না। আমাকে 'আপনি' বলাটা সঙ্গত বা শোভন কি না, সেটাও ভেবে দেখবার কথা। এ সব ভেবে যদি মনে করেন আমার দ্বারা সে কাজ হতে পারে, তাহলে আমাকে বল্‌বেন।

বিভা। আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যে কত কঠিন, সে কথা যে জিজ্ঞাসা করতে আসে সেই জানে। তিন দিন চেষ্টা করে আপনার সঙ্গে দেখা করলাম। আবার ক'দিন পরে কথা টা বল্‌তে পারি দেখুন।

নিত্য। আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি আমার প্রভুর কন্যা। আমার শ্রদ্ধার পাত্রী। আমি আপনাদের বেতনভোগী, আমার যেটুকু শ্রদ্ধা বা সম্মান প্রাপ্য, তার চেয়ে বেশী আশা করা বা ইচ্ছা করা আমার অনুচিত। আমি সেই জন্য এই সম্মানপূর্ণ ব্যবধান রেখে চলি। পাছে আমার সঙ্গে বেশী সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে আপনাদের মনে বা অপর কারুর মনে কোনরূপ গ্লানি আসে, সেইজন্য আমি একটু সতর্ক হয়ে চলি মাত্র। এর জন্য আপনারা কেউ ক্ষুব্ধ হবেন না। এখন কি কথা আপনার বলুন?

বিভা। দিদির কথা আপনি শুনেছেন বোধ হয়?

নিত্য। কিছু শুনেছি।

বিভা। দিদি আমার জন্য তার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছে। আমায় ফেলে দিদি যেতে পারেনি বলে শেষটা জামাইবাবু রাগ করে চলে যান। তারপর গুজব শুনা যায় যে, তিনি ফের বিবাহ করেছেন। বাবা সেই থেকে এমন মুষড়ে যান যে, কথাটা সত্য কি না তাও খোঁজ নিতে তাঁর সাহস হয়নি। দিদি তো হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। আমি আগে তো এ সব ঠিক বুঝতে পারতাম না। কিন্তু এখন আমার মনে হয়, হয়ত দিদির আশঙ্কা মিথ্যা, জামাইবাবু হয়ত আর বিবাহ করেন নি।

নিত্য। কতদিন হ'ল তিনি আসেন নি বা তাঁর আর কোন খবর পান নি ?

বিভা। দু'বছর।

নিত্য। এক বছরের মধ্যে আর তাঁর কোন সন্ধান নেওয়া হয়নি ?

বিভা। তাঁর খবর পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। তিনি ভালও আছেন। কিন্তু তাঁর বিয়ের খবরটা আমাদের মনের মধ্যে এমন ভাবে বসে গিয়েছে যে, সে সম্বন্ধে আর আমরা কোন সন্ধানই নিই নে।

নিত্য। তাঁর আর কোন ভাই আছে ?

বিভা। তাঁর ছোট একজন আছেন।

নিত্য। তিনি কি করেন জানেন ?

বিভা। তখন তো স্কুলে পড়তেন, এতদিন হয়ত কলেজে পড়ছেন বা পড়া শেষ করেছেন।

নিত্য। সঞ্জীববাবু বেশীর ভাগ সময় বকুল-দীঘিতেই থাকেন ?

বিভা। তা ঠিক বলতে পারিনে। সুন্দরবনের ওদিকে তাঁদের একটা বড় মহাল আছে ; সেখানেও মাঝে মাঝে যেতেন শুনেছি।

নিত্য। আমাকে তাহলে কি করতে হবে বলুন ? শুধু তিনি বিবাহ করেছেন কি না—এই খবরটি আনতে হবে, না আরও কিছু ?

বিভা। সন্ধান তো নিতেই হবে, তা ছাড়া চেষ্টা করতে হবে তিনি যাতে নিজে এসে দিদিকে আদর করে নিয়ে যান অর্থাৎ সাদরে গ্রহণ করেন। দিদির বাহিরে হাস্যমুখ থাকলেও মনে তার সুখ নেই। আর আমিই এর একমাত্র কারণ।

নিত্য। আচ্ছা আমি চেষ্টা করব; কিন্তু আমাকে ত ছুট নিয়ে যেতে হবে। সে ক'দিন কাজ কে চালাবে? আবার তো সেই বিজ্ঞাপন দিতে হবে?

বিভা। না তা হবে না; সাম্‌নে আমাদের 'Good-Friday'র ছুটি আস্‌ছে। আপনি এই ছুটিতে যান। আমরা এ ক'দিন নিজেরাই রাঁধব। যদি আপনার কিছু দেরী হয়, তাহলেও আমরা চালিয়ে নেব। কিন্তু বাবাকে এ কথা বলবেন না এখন।

নিত্য। সেটা কিন্তু ভাল হবে না। কোন বিষয় লুকানর চেষ্টা ভাল নয়। আমি যদি সব কথা তাঁকে বলে তাঁর মত নিতে পারি, তাতে ক্ষতি কি?

বিভা। তাতে অবশ্য ক্ষতি নেই; কিন্তু আমার মনে হয় তিনি মত না দিতে পারেন। সে জন্য মনে হয়, যদি না বলেও যান, হয়ত দোষ হবে না; কারণ, উদ্দেশ্য নিয়ে কাজের বিচার হয়।

নিত্য। কিন্তু তাতে একটু সত্য গোপন করতে হয়। যদি তা না করে কার্য্যসিদ্ধ হয়, ক্ষতি কি?

বিভা। যদি না মত দেন এই আশঙ্কাটুকুই ক্ষতি। আর যখন আপনার আমার জীবনে কিছু-না-কিছু সত্য গোপন থাকেই।

নিত্য। আমি তাঁর মত নেওয়ার দায়িত্ব নিচ্ছি। যেমন করে হোক্, তাঁর মত আমি নেব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

"তাহলে আপনি বিশ্রাম করুন, আমি উঠ্‌লাম।"

বলিয়া বিভা উঠিয়া শয্যার দিকে একবার তাকাইল। এই শয্যাভ্যন্তরে যে বইখানি আছে, তাহার নামটি জানিবার জন্য তাহার বড়ই কৌতূহল হইতেছিল।

কৌতূহল দমন করিয়া বিভা ধীরে ধীরে সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

১৩

বকুল-দীঘিতে নিত্যধন গিয়া এক গ্রামবাসীর নিকটে প্রথমে গোপনে সঞ্জীব সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিল। প্রথম সংবাদই তাহার পক্ষে খুব আশাপ্রদ। সঞ্জীব পুনরায় বিবাহ করিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিতে নিত্যধন শুনিল, তিনি কি সে রকম মানুষ যে এক স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবেন?

এ সম্বন্ধে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সে বলিল, বিশেষ কিছু বিবরণ আমি জানিনে। আপনি আর একটু এগিয়ে জমিদারবাড়ীতে যান্। সেখানে তাঁর ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করলে সব সঠিক ও বিস্তারিত খবর পাবেন।

খানিকটা আগাইয়া সে জমিদার-বাড়ীর সম্মুখে পৌছিল। প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা। প্রকাণ্ড দরজা, উপরে গাড়ী-বারান্দা। দরজার দুই পাশে সুদৃশ্য রেলিং দিয়া ঘেরা দুইটি পুষ্পোত্থান গৃহ-স্বামীর সুরুচির পরিচয় দিতেছে। একটি সুদৃশ্য যুবক, বয়স আন্দাজ ২৩।২৪ বৎসর হইবে, বাগানের মালিকে কার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছে। একপ্রকার সুন্দর লতা রেলিং বেড়িয়া তাহাকে ঘন-শ্যামল করিয়া তুলিতেছে। দুই

বাগান হইতে দুইটি মাধবীলতা উঠিয়া প্রকাণ্ড দরজা ও উপরকার বারান্দাকে যেন সুরভির মালা পরাইয়া দিতেছে।

নিত্যধন অগ্রসর হইয়া বলিল, নমস্কার! আপনিই চিরঞ্জীব বাবু বোধ হয়?

"আপনি কোথা থেকে আস্‌চেন?"

"আমি আসচি আপাতত কল্‌কাতা থেকে; আপনাকে গোটা কয়েক কথা গোপনে জিজ্ঞাসা করতে চাই, সময় হবে?"

যুবক ইঙ্গিতে ভৃত্যকে সেখান হইতে সরিয়া যাইতে বলিয়া নিকটস্থ একটি প্রস্তরাবাস নির্দ্দেশ করিয়া তাহাকে বসাইয়া আপনি পাশে বসিল।

"কি কথা বলুন" চিরঞ্জীব বলিল।

নিত্যধন বলিল, আমি আপনার দাদার শ্বশুর সূর্য্যপ্রকাশ বাবুর ভৃত্য। সেখান থেকে আসছি। আপনার দাদা কোথায়?

মুহূর্ত্তে চিরঞ্জীবের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।—আপনি সেখান থেকে আসছেন? বেশ বেশ! সেখানকার সব খবর ভাল তো? বৌদিদি ভাল আছেন?

নিত্য। হ্যাঁ, সব ভাল; তবে তিনি বড়ই ম্রিয়মাণ। তাঁর সহোদরা বোন্‌কে দেখ্‌তে গিয়ে তাঁর ভাগ্যে যে এমন বজ্রপাত হবে তা তিনি প্রথমে বুঝতে পারেন নি। যখন বুঝতে পারলেন, তখন প্রায় একেবারে সংশোধনের অতীত হয়ে গিয়েছে।

চিরঞ্জীব। সংশোধনের অতীত তো হয়নি। এইখানেই তো তাঁর ভুল হয়েছে। যখনি তাঁর মনে দুঃখ হয়েছিল তখনি তিনি এলেন না কেন?

নিত্য। শুধু তিনি কেন, তাঁরা সবাই স্থির বিশ্বাস করে আছেন, আপনার দাদা আবার বিবাহ করেছেন এবং তাঁর প্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।

চিরঞ্জীব। তিনি কোন খবর একবার নিয়ে দেখেছিলেন ?

নিত্য। তাঁরা সব এই ভেবেছিলেন, সঞ্জীববাবু বলে এসেছিলেন, তাহলে আর আসতে হবে না। মা সে ব্যবস্থা করবেন। তারপর কোন খবর তাঁর নেওয়া হয়নি। মাঝ থেকে এখানে বিবাহের গুজবও একটা তাঁরা শুনেছিলেন। কাজেই তিনি যে নির্ব্বাসিতাই রয়ে গেলেন এই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস রয়ে গেল।

চিরঞ্জীব। বিবাহের কথাবার্ত্তা যে হয়নি তা নয়। মা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে এ ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু দাদাকে যাঁরা জানেন, তাঁরা জানেন দ্বিতীয় বার বিবাহ করা দাদার পক্ষে কত কঠিন। প্রথম যাঁরা বিবাহে চেষ্টা করছিলেন, তাঁরা প্রথম বিবাহটা উল্লেখ না করেই— করছিলেন। দাদা বল্লেন—"মা, সে হবে না; আমার বিবাহের জন্য তুমি মিথ্যার পাপ নিতে যেও না। সে আমি সহ্য করতে পার্‌ব না।" তখন প্রথমা স্ত্রী বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বার বিবাহ হচ্ছে এ সংবাদ প্রকাশ হ'ল। তাতেও যে বহু পাত্রীর পিতারা সম্মত হবেন, তা দেশের অবস্থা দেখেই বুঝতে পারেন। এই সব লোকদের মনের নীচতা দেখে, গ্লানিতে দাদার সারা মন ভরে গেল। একদিন অবসর বুঝে মাকে দাদা বল্লেন—"মা, তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে। সেই ছেলেবেলায় যখন যা চেয়েছি তখনি তাই দিয়েছ —আজ এই বুড়ো বয়সে একটা জিনিস তোমার কাছে পেতে চাই মা, পাব কি ?"

কথাটা বল্‌তে দাদার চোখে জল এল ; মার চোখেও জল এল। মা দাদার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বল্লেন—"বাবা, বিয়ে করতে অমত করা ছাড়া তুমি যা বল্‌বে—আমি তাই কর্‌ব।"

দাদা বল্লেন, "আমার যা বল্‌বার, আগে বল্‌তে দাও। তারপর—

তুমি নিজের মত দিও। এক স্ত্রী আছে জেনে-শুনেও যারা মেয়ে দিতে আসছে তারা কি রকম প্রকৃতির, তোমার বুঝতে বাকি নেই। এই সব মেয়েদের একজন তোমার বংশের বধূ হবে, এ তুমি সহ্য করতে পারবে মা? আর মনের কি উচ্চ আদর্শ তুমি চিরদিন আমার চোখের সামনে ধরেছ, তাও ভেবে দেখ। তারপর ঐ রকম নীচবংশের স্ত্রী নিয়ে আমার জীবন কি দুর্ব্বিষহ হবে সে কথা একটিবার ভেবে দেখ। আমি অপবিত্র হয়ে যাব, তোমার বংশ অপবিত্র হয়ে যাবে। তার চেয়ে আমি যেমন আছি, আমাকে এমনিই থাকতে দাও মা! তোমাকে যে অপমান করেছে, তাকে আমি তোমার আদেশ ব্যতীত কখনও গ্রহণ করব না। কিন্তু বৌ না হলে যখন তোমার চল্‌বে না, তুমি ছোট ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে নিয়ে এস।"

মা খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বল্‌লেন, "তোর কথাও ঠিক কথা। কিন্তু আমার অপমান করেছে বৌমা, তাই আমি তার ওপর রাগ করেছি একথা তুই ভাবিস নে। সে তোদের চৌধুরী বংশের অপমান করেছে, যে বংশ তোর চেয়ে আমার চেয়ে বহু বহু গুণ উঁচু। সে এসে যদি নীচ বৌদের মত আমাকে অপমান করত, আমার অধিকার খর্ব্ব করতে চাইত, আমি তাকে প্রসন্নচিত্তে মার্জ্জনা করতাম। কিন্তু সে আমাদের বংশের অপমান করেছে, তাই আমি তাকে এ অবস্থায় আর ডাক্‌তে পারিনে। নইলে সে যে আমার কত প্রিয়, তা কেবল ভগবান্‌ই জানেন।" বল্‌তে বল্‌তে মায়ের চোখে জল এল। মা চোখ মুছে বল্‌লেন, "তোর কথাই থাক সঞ্জীব! চিনুর বিয়ের ঠিক কর। আমার অদৃষ্টে নাই, তাই তোর মত ছেলের বৌ আর অমন বৌ নিয়ে ঘর করতে পারলাম না। কিন্তু একটা কথা বাবা, তুই তাকে কোনদিন ডাক্‌লে, আমার নয়—তোর বংশের অপমান হবে। ডাক্‌তে

পাবিনে, কিন্তু যদি সে আপনি আসে, এসে বলে 'আমি এসেছি', যখনি—যে মুহূর্ত্তে সে আসবে, তখনি সেই মুহূর্ত্তে আমি তাকে বুকে তুলে নেব।"

মায়ের চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছিল, আর দাদাও চোখ মুছে মায়ের পায়ের ধূলো নিয়ে বল্লেন—"মা, আমি তোমার আশীর্ব্বাদে তোমার অমর্য্যাদা—আমাদের বংশের অমর্য্যাদা করব না।" সে দিন থেকে দাদা আজ পর্য্যন্ত আপন প্রতিজ্ঞা রেখেছেন। আমরাও নিরুপায় হয়ে আছি।

নিত্যধন সব শুনিয়া একটু ভাবিয়া বলিল, এর জন্য এমন নিরাশ হবার কিছু নেই। আমি বুঝেছি, চল্লাম।

নিত্যধন চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। চিরঞ্জীব বলিল, আপনি ক্লান্ত, দূর থেকে আসছেন। এখন যাওয়া ত হতে পারে না।

নিত্যধন হাত যোড় করিয়া বলিল, আজকের দিন ক্ষমা করুন, আবার যখন আসবো যতদিন বলবেন খেয়ে যাব, আজ এই পর্য্যন্ত।

চিরঞ্জীব কিছু বলিবার আগেই নিত্যধন সেস্থান ত্যাগ করিল।

নিত্যধন ফিরিয়া আসিয়া সব কথা প্রকাশ করিয়া বলিল, এখন অবিলম্বে প্রভা দিদিকে লইয়া যাওয়ার প্রয়োজন।

সূর্য্যপ্রকাশ আনন্দে আত্মহারা দিশেহারা হইলেন। বলিলেন, নিত্য, এ-সম্বন্ধে যা কিছু ব্যবস্থা করা দরকার তোমার ভার, এবং আজ থেকে রান্নার কাজ তোমার নয়—তুমি আমার সেক্রেটারী, বুদ্ধিদাতা। আমার সমস্ত সম্পত্তি দিলেও তোমার ঋণ শোধ হবে না। আজ থেকে তোমার বেতন শুধু ২৫৲ টাকা নয়, ২২৫৲ টাকা, তা ছাড়া তোমার যা কিছু খরচ, সমস্ত ষ্টেট থেকে পাবে। তোমার এখন হয়ত কেউ নাই। যখন বৌ হবে, পৃথক বাড়ী পাবে ষ্টেট থেকে।...উঃ আমি কি মূর্খ! মিথ্যা কল্পনায় বিনা অনুসন্ধানে মেয়েটকে কি কষ্ট দিয়েছি!

কোথায় বা কেন যে নিত্য গিয়াছিল, প্রভা এ সমস্ত ব্যাপারের কিছুই অবগত ছিল না। অবাক্-বিস্ময়ে সে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া পরে লজ্জার দৃষ্টি নামাইয়া লইয়া বোধ হয় উদ্গত অশ্রু সংবরণের জন্য গৃহান্তরে গেল।

বিভা কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া একটিবার প্রশংসমান দৃষ্টিতে নিত্যধনের মুখের পানে লুকাইয়া চাহিয়া দিদির অনুসরণ করিল।

কক্ষান্তরে আসিয়া দেখিল প্রভা আপনার ঘরে বসিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। বিভা দিদিকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কহিল, আজ অমন করে কাঁদছ কেন দিদি? আজ যে তোমার সুখের দিন!

প্রভা কিছুক্ষণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া শান্ত হইল। মুখে কিছুই বলিল না। সে যেন বাক্য হারাইয়া ফেলিয়াছিল!

তৃতীয় দিনেই নিত্যধনের পরামর্শ মত প্রভাকে লইয়া যাইবার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গেল; বিভা ধরিয়া বসিল, সেও সঙ্গে যাইবে। স্থির হইল—সূর্য্যপ্রকাশ, নিত্যধন ও বিভা তিন জনেই সঙ্গে যাইবেন। দেশে টেলিগ্রাম গেল, সেখান হইতে একজন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী সূর্য্যপ্রকাশের অনুপস্থিতির সময়ে রহিবে। মাঝে একটি মাত্র দিন ছিল। ব্যবস্থাদিতেই কাটিয়া গেল।

জমিদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা—প্রথম শ্বশুরবাড়ীর ঘর করিবার জন্য যাত্রা করিবে। বহু জিনিসপত্রই কেনা হইল, ঘর থেকেও বাহির হইল। কিন্তু নিত্যধনের নির্দ্দেশে তাহা গৃহে জমা করাই রহিল। সকলে একটু বিস্মিত হইল। নিত্যধন সূর্য্যপ্রকাশকে বুঝাইল, এখন কোন রকম আড়ম্বর করিবার প্রয়োজন নাই। জিনিসপত্র পরে দিলেই চলিবে। উভয়েই ধনী ও জমিদার। কাজেই না দিলেও ক্ষতি নাই।

সকলেই অল্প-বিস্তর মতামত, আনন্দ ও উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছিল; কেবল প্রভা নীরব ছিল। লজ্জা, আনন্দ, উৎকণ্ঠা একে একে তাহার চিত্ত অধিকার করিতেছিল। সে ভাবিয়াছিল নিত্যধন তো সব বাহিরের খবর লইয়া আসিয়াছে। তাহার স্বামীর মনের খবর সে কিছুই জানে না। গ্রহণ করা শুধু সংসারে, কি স্বামী তাহাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছে—এ-বার্ত্তা এখনও তাহার কাছে পৌঁছে নাই। হয়ত তিনি মনের সঙ্গেই গ্রহণ করিবেন। নইলে বিবাহে তিনি আপত্তি করিবেন কেন? কিন্তু যদি তিনি বলিয়া বসেন, বেশ এসেছ, ভালই। বাড়ীর ভিতরে যাও; কাজকর্ম্ম ও নিজের জায়গা দেখে নেও; তখন? যদি কেহ বলে, কেন তখন যে আস নাই বড়! এখন কি মনে করে? তা

বলে বলুক ; তবু সে যাইবে ও থাকিবে। বলিবে—এই তাহার ঘর, এই তাহার স্থান—তাই আসিয়াছে।

প্রভা আবার মনকে প্রবোধ দিল, নিশ্চয়ই তিনি অনাদর করিবেন না। করিলে এতদিন তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতেন না ; মাকে এত করিয়া বিবাহ দেওয়া হইতে নিবৃত্ত রাখিতেন না। আর সে তো একেবারে একা যাইতেছে না, সঙ্গে বিভা থাকিবে ; নিত্যধন, যে সব দেখিয়া শুনিয়া আসিয়াছে সেও থাকিবে।

আশায় আকাঙ্ক্ষায় মাঝের দিনটি কাটিয়া গেল। পরদিন সকালে সবাই শিয়ালদহ আসিয়া ট্রেণ ধরিলেন। সকলেই এক গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন, যাহাতে কথাবার্ত্তায় সময়টুকু ভালভাবে কাটিয়া যায়। অপরাহ্ণে বকুল-দীঘি পৌঁছিলেন। নিত্যধন গাড়ীর আড্ডা দেখিয়া গিয়াছিল। তাড়াতাড়ি আসিয়া গাড়ী ঠিক করিয়া আনিল। মিনিট দশেকের মধ্যে গাড়ী নিত্যধনের পূর্ব্বদৃষ্ট অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া থামিল।

উদ্যানের সম্মুখে কক্ষটিতে চিরঞ্জীব বসিয়া ছিল। গাড়ীখানি তাহাদের অট্টালিকার সামনে থামিল দেখিয়া সে উঠিয়া আসিল এবং দূর হইতে নিত্যধনকে গাড়ী হইতে নামিতে দেখিয়া কাহারা আসিতেছে বুঝিয়া ছুটিয়া নিকটে আসিল। ততক্ষণ সকলেই নামিয়াছেন। সে তাহাদের সকলকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া উপরে লইয়া গিয়া অন্তঃপুর ও বাহিরের মাঝামাঝি একটি সুসজ্জিত কক্ষে সূর্য্যপ্রকাশ ও নিত্যধনকে বসাইয়া প্রভা ও বিভাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

দূর হইতে মাকে দেখিবামাত্র চিরঞ্জীব বালকের মত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, মা, বৌদিদি এসেছেন, সঙ্গে তাঁর ছোট বোন।

মা তখন একটি কম্বলাসনে বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন। এই কথা শুনিবামাত্র তিনি মাথা ভূমিতে নত করিয়া দেবতার উদ্দেশে

প্রণাম করিলেন। পরে মালা মস্তকে স্পর্শ করাইয়া গলায় পরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রভা আসিয়া প্রথমে নত হইয়া প্রণাম করিতেই তিনি তাহাকে উঠাইয়া অশ্রু-বিগলিত চক্ষে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, এস মা, বংশের লক্ষ্মী এস মা, এস মা, সংসারের লক্ষ্মী এস মা। আমি যে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ তোমার জন্য বসে ছিলাম মা!

পরে বিভার দিকে লক্ষ্য পড়িতে বলিলেন, *এটি বুঝি তোমার সেই* ছোট বোন্, বৌমা?

প্রভা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ। বিভা নত হইয়া প্রণাম করিতে তিনি আবেগে উঠাইয়া চিবুকে হাত দিয়া চুম্বন করিলেন। বলিলেন, কার সঙ্গে এসেছ বৌমা?

প্রভা মৃদুস্বরে বলিল, বাবা এসেছেন আর সঙ্গে তাঁর একজন কর্ম্মচারী আছেন।

চিরঞ্জীবকে তখনি তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য যাইতে আদেশ করিয়া তিনি প্রভা ও বিভাকে লইয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। সে কক্ষে চিরঞ্জীবের স্ত্রী আসিয়া তাহাদের প্রণাম করিল। শাশুড়ী দুই বা'কে পরিচিত করাইয়া দিলেন।

উত্তেজনায় প্রভার পদদ্বয় কাঁপিতেছিল। হাত-মুখ ধুইয়া মাথায় পায়ে জল দিয়া শাশুড়ীর কাছে শয্যার উপর বসিয়া প্রভা একটু সুস্থ হইল। তখনও তাহার কুতূহলী চক্ষু যাহাকে চারিদিকে খুঁজিয়াও দেখিতে পায় নাই, তাঁহার জন্য তাহার উদ্বেগাকুল মনে প্রশ্ন জাগিতেছিল—কিন্তু তিনি কোথায়?

মা ডাকিয়া পাঠাইতেই চিরঞ্জীব সন্ধ্যার পরেই একবার ভিতরে আসিল। একটু পরেই সে ফিরিয়া আসিয়া সূর্য্যপ্রকাশকে বলিল,—মা আপনার একবার ভিতরে দর্শন প্রার্থনা করছেন।

সূর্য্যপ্রকাশ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া চিরঞ্জীবের সঙ্গে অন্তঃপুরে আসিলেন। মাথায় অর্দ্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া চিরঞ্জীবের মা সূর্য্যপ্রকাশকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিলেন,—আপনার পায়ের ধূলোয় আজ আমাদের গ্রাম, আমাদের বাড়ী পবিত্র হ'ল। আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

সূর্য্যপ্রকাশ স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন, ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন। আপনি প্রভার ভুল ক্ষমা করে তাকে যে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, সে জন্য আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

চিরঞ্জীবের মাতা বলিলেন, এ কথার উল্লেখ করে আর আমাকে লজ্জা দেবেন না। বার-কয়েক বৌমা আসতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় সত্যিই আমি বড় দুঃখ ও অপমান জ্ঞান করেছিলাম। তার ফলে রাগও হয়েছিল, রাগের বশে সঞ্জীবের বিয়ে দেব মনেও করেছিলাম। সঞ্জীব আমায় সে অন্যায় ও পাপ থেকে বাঁচিয়েছে। সে দিন থেকে বসে আছি কবে কতদিনে বৌমা আস্‌বেন! তবে মানের মোহে কেবল ডাকৃতে পাঠাইনি বা ডাকৃতে দিইনি। আজ আপনি যে বৌমাকে এনে আমাকে দিলেন, এ দয়া আমার চিরদিন মনে থাকবে।

সূর্য্যপ্রকাশ বলিলেন, এর জন্য বেয়ান আপনার মনে কোন গ্লানি রাখ্‌বেন না। এ অবস্থায় আপনি যা করতে গিয়েছিলেন, রাগের বশে

মানুষে তাই করে ফেলে। ত্রুটি বরং আমারই হয়েছে। আমারই এ রকম হতে দেওয়া উচিত হয়নি। জোর করে প্রভাকে প্রথমে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। আমি তা পারিনি, সেজন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি বেয়ান।

বেয়ান হাতযোড় করিয়া কহিলেন, অমন কথা বল্‌বেন না। আপনার মেয়ে ঘরে এনে আমাদের গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে। তার উপর আপনি পায়ের ধূলো দিয়েছেন, এ সৌভাগ্যের তুলনা হয় না।

কথাবার্ত্তায় ও জলযোগের পর চিরঞ্জীবের সঙ্গে সূর্য্যপ্রকাশ পূর্ব্বকক্ষে ফিরিয়া গেলেন। একটু পরে সঞ্জীব সংবাদ পাইয়া শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। সঞ্জীব ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া সকলের কুশল প্রশ্ন করিল। বিভাও সঙ্গে আসিয়াছে শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিল, একটা খবর পেলে আমরা সকলে ষ্টেশনে উপস্থিত হ'তাম। আপনার আস্‌তে কষ্ট হ'ত না। আপনি যে কখনও দয়া করে আসবেন, এ-কথা ভাবিনি।

সূর্য্যপ্রকাশ বলিলেন, দরকার হলে কেন আসব না বাবা? আমার ছেলে নাই, তুমিই ছেলে। বড় মনঃকষ্টে ছিলাম। তোমার মায়ের উদারতা আর তোমার গুণে আজ আমার সে কষ্ট দূর হ'ল।

সঞ্জীব বলিল, আপনি এ কথার আর উল্লেখ করবেন না। ওতে আমাদের দোষই বেশী।

তারপর দুই ভাই সূর্য্যপ্রকাশ ও নিত্যকে লইয়া বহির্বাটীর সমস্ত অংশ উদ্যানাদি দেখাইয়া গ্রাম দেখাইতে লইয়া গেল। সন্ধ্যার পরে সকলে ফিরিলেন। সূর্য্যপ্রকাশ গ্রামের বিদ্যালয়, পাঠাগার, দাতব্য চিকিৎসালয়, হরিসভা, মন্দির, মসজিদ ইত্যাদির সুব্যবস্থা দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

রাত্রে আহারের সময় সকলে এক সঙ্গে অন্তঃপুরে আসিলেন।

পুরুষদের ভোজন শেষ হইলে তাহারা সব শয়নকক্ষে চলিয়া গেল, মেয়েরা আহারে বসিল। প্রভা নামমাত্র আহার করিতেছিল। শাশুড়ী অনুযোগ করিয়া বেশী আহারের জন্য বারবার জিদ করিতে লাগিলেন। শেষে দুই যাকে একত্র রাখিয়া আড়ালে আসিলেন। স্বল্প ও মন্থরগতি আহারের মধ্যে দুইজনের সখীত্ব জমিয়া উঠিতে লাগিল।

"তোমার নাম কি ভাই?"

"ইন্দিরা।"

"তুমি কতদিন এসেছ?"

"এই দু'বছর হ'ল!"

"বিয়ের পর এসে বরাবর আছ?"

"না, মাঝে একবার একমাসের জন্য বাপের বাড়ী গিয়েছিলাম।"

"দু' বছরের মধ্যে আর যাওনি?"

"না দিদি! এবার তুমি এসেছ, এবার হয়ত একমাস ছুটি পাব।"

"আবার একমাস পরেই আসবে তো?"

"নিশ্চয়ই আসব। আর আমি খুব শীগ্‌গির যাচ্ছিনে। দিনকতক তোমার সঙ্গে একসঙ্গে থাকি; তারপর যাব।"

"তুমি আমার কথা শুনেছিলে?"

"হ্যাঁ, খুব শুনেছিলাম। তোমাকে দেখতে ইচ্ছা করত কিন্তু তুমি তো আসতে না।"

"কি করব ভাই, আমার আসা যে নিষিদ্ধ ছিল।"

এবার বিভা কথা কহিল, আর কেন নিষিদ্ধ ছিল জানেন তো? এই পোড়ারমুখীর জন্য।

ইন্দিরা বলিল, তুমি পোড়ারমুখী হতে গেলে কেন ভাই? এমন সুন্দর তোমার মুখ, চন্দ্রমুখী অর্থাৎ শরদিন্দুনিভাননী।

বিভা বলিল—ছাই নিভাননী। আমারি জন্ত ত দিদির এই বত লাঞ্ছনা! যেন কত অপরাধ করেছে—এই ভাবে আসতে হয়েছে! নইলে দিদির কি দোষ?

ইন্দিরা বলিল, দোষ এই যে বিয়ের পর মেয়েমানুষের বাপ, ভাই,—যেমন সব ভুলে যেতে হয়, দিদি ভুলে যেতে পারেন নি; সহোদরা বোনের উপর কর্ত্তব্য করতে গিয়েছিলেন, তাই এই বিপত্তি। এ দোষ এঁদের কারুর নয়, এ দোষ আমাদের দেশের—আমাদের সমাজের।

দূর হইতে শাশুড়ীর সাড়া পাওয়া গেল। তিনি খানিকটা কাছাকাছি আসিয়া বলিলেন, বৌমা, আর রাত কোরো না তোমরা; কাল সব গল্পসল্প কোরো। আজ আর দেরী না করে কাজ মিটিয়ে নাও মা। বিভা মা, তুমি আঁচিয়ে আমার কাছে শোবে; আমি জেগেই আছি।

কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়া তিনজনে শীঘ্র আহার সমাপ্ত করিয়া উঠিল। হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া ইন্দিরা বলিল, মা, আপনি যে কিছু খেলেন না?

তিনি বলিলেন, আজ আর খেতে পারব না কিছু। আজ বহুকাল পরে আমার হারানিধি ফিরে পেয়েছি, আজ আনন্দে পেট ভরে গিয়েছে। এস মা বিভা, তুমি আমার কাছে শোবে। যাও মা, তোমরা শোওগে।

শাশুড়ী বিভাকে কাছে লইয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলেন। দুই বধূ সে স্থান ত্যাগ করিল।

ইন্দিরা বলিল, আমি ছোট হলেও দিদি, আজ তোমাকে পৌছে দিয়ে যাব।

প্রভা কিছু বলিল না। নীরবে ইন্দিরার অনুসরণ করিল।

স্বামী যে আজকাল কোন্ ঘরে শয়ন করেন তাহাও প্রভা জানিত না। কয়েকখানি কক্ষ পার হইয়া মুক্তদক্ষিণ একটি সুপ্রশস্ত কক্ষের সম্মুখে

দাঁড়াইয়া নিম্নস্বরে ইন্দিরা কহিল, এই ঘর দিদি; বড় ঠাকুর জেগে' রয়েছেন। আমি আর এগুবো না, তুমি যাও।

"হ্যাঁ ভাই, তোমারও এবার পেছুবার সময় হয়ে এসেছে, তুমিও যাও; কাল থেকে আমি তোমাকে ঘরের মধ্যে পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসব।"

বলিয়া প্রভা মৃদুহাস্যের সহিত ইন্দিরাকে বিদায় করিল।

ইন্দিরা লজ্জিত হাস্যের সহিত আপনার কক্ষের দিকে চলিল।

প্রভা আপনার বসন বেশ ভাল করিয়া সম্বৃত করিয়া লইয়া দুরু দুরু বক্ষে বহুকাল পরে স্বামীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দুয়ার বন্ধ করিল।

সঞ্জীব কক্ষমধ্যে একটি আলোকের সম্মুখে বসিয়া একখানি বই হাতে বুঝি কাহারো পদধ্বনির অপেক্ষায় বসিয়া ছিল! প্রভা আসিয়াছে ইহা সঞ্জীব শুনিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত তাহাকে দেখে নাই। বৎসর কয় পূর্ব্বেকার প্রভার সেই কিশোরী মূর্ত্তি এখনো সঞ্জীবের মনের মধ্যে গাঁথা আছে।

দুয়ার বন্ধ করিবার মৃদু শব্দে সঞ্জীব মুখ তুলিয়া চাহিল। দুয়ার বন্ধ করিয়া সঞ্জীবের দিকে ফিরিতে সঞ্জীব দেখিল, প্রভা আজ পরিপূর্ণ যৌবনের সৌন্দর্য্যসম্ভার লইয়া নূতন বেশে আসিয়াছে। মুখখানি তখনও ঈষৎ ম্লান; কিন্তু সে ম্লানিমা মুখের সৌন্দর্য্য হ্রাস না করিয়া মুখখানিকে যেন আরও মনোরম করিয়াছে! সঞ্জীব আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল, প্রভা সঞ্জীবের দিকে আসিতেছিল। অর্দ্ধপথে তাহাদের দেখা হইল। প্রভা নতজানু হইয়া প্রণাম করিতে যাইবে, এমন সময়ে সঞ্জীব তাহার হাত ধরিয়া তুলিল ও সঙ্গে করিয়া আপনার শয্যার উপরে বসাইল। আবেগ-জনিত উত্তেজনায় প্রভার হাত দুখানি কাঁপিতেছিল।

সঞ্জীব সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, এখনো তুমি শান্ত হতে পারনি?

প্রভা কম্পিতস্বরে বলিল, তুমি আমাকে একেবারে ত্যাগ করনি, কিন্তু এখনও তো গ্রহণ করনি!

সঞ্জীব তাহাকে আরও নিকটে বুকের কাছে আনিয়া বলিল, আমি তো কোন দিন তোমাকে পরিত্যাগ করিনি।

"তবে কেন সেদিন সময় চাইতে আমাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলে ?"

"আমি তো কোন দিন ভুলেও—"

তারপর প্রভা তাহার অর্দ্ধসমাপ্ত কথার মাঝে স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল।

সঞ্জীব প্রভার মাথায় হাত বুলাইয়া, পিঠের উপর হাত বুলাইয়া নীরবে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

নরনারীর শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা চিরদিন বুঝি তাহাদের প্রিয়তমের বক্ষমাঝেই লুকাইয়া থাকে।

১৬

দুইদিন পরে সূর্য্যপ্রকাশ, নিত্যধন ও বিভা বকুল-দীঘি হইতে কলিকাতা যাত্রা করিল। অপরাহ্ণে যখন নিত্যধন শিয়ালদহে নামিয়া বিভা ও সূর্য্যপ্রকাশকে নামাইয়া লইল, তখন এক যুবক দূর হইতে তাহাদের লক্ষ্য করিল। জনতার মাঝেও সে অবাক্-বিস্ময়ে কিয়ৎক্ষণ তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল। তাহারা প্ল্যাট্‌ফরম ত্যাগ করিতে, সে যুবকও দূর হইতে তাহাদের অনুসরণ করিল। যুবক দেখিল, তাহারা ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়াই একখানা গাড়ি লইল। গাড়িতে বসিতেই গাড়ি ছাড়িয়া দিল। যুবকও সঙ্গে সঙ্গে আর একখানি গাড়ি করিল, তাহার চালককে বলিল, ঐ লাল রংয়ের গাড়িখানার পিছু ধর। চালক তাহাই করিল।

সূর্য্যপ্রকাশের বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া গাড়ি থামিল। দ্বারবান সসম্ভ্রমে গেট খুলিয়া দিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। সকলে নামিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। পিছনের গাড়িখানা বাড়ী চিনিয়া রাখিয়া একটু দূরে সরিয়া গেল। আরোহী যুবক সেখান হইতে গাড়ি ছাড়িয়া দিয়া হাঁটিয়া সেই চেনা বাড়ী পর্য্যন্ত আসিল।

ঠিক সেই সময়ে ভৃত্য নবীন কি একটা কাজে বাড়ী হইতে বাহির হইতেছিল।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ বাপু, তুমি কি এই বাড়ীতে কাজ কর?

নবীন উত্তর করিল, হ্যাঁ করি। কেন বলুন তো?

তাহার মেজাজটা আজ ভাল ছিল না।

যুবক বলিল, না বিশেষ কিছু নয়; এ বাড়ীর কোন খবর জান কি না তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। কতদিন এখানে আছ?

নবীন একটু উষ্মার সহিত বলিল, কতদিন সে কথা আর বলবেন না। আজ ১৫ বৎসর এ বাড়ীতে কাজ করছি। কিন্তু সে দিন-কাল আর নেই যে পুরানো লোকের খাতির থাক্‌বে। এখন উড়ে এসে লোক জুড়ে বসে।

নবীনকে সামাজিক গবেষণায় বেশী সময় না দিয়া যুবক বলিল, খানিকটা আগে গাড়ি করে এক আধবয়সী ভদ্রলোক সঙ্গে এক যুবক ও এক যুবতী বাড়ীর ভিতর গিয়েছিলেন, ওঁদেরই বুঝি বাড়ী?

নবীন একটু বিরক্ত হইয়াই বলিল, ওঁদের নয় কি আমার বাড়ী? ওঁদের তো বটেই!

যুবক আবার জিজ্ঞাসা করিল, এই যে যুবকটি, কে বল্‌তে পার?

নবীন তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, বল্‌তে আর পারব না কেন? সব জানি, সব বল্‌তেও পারি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করেই বা কে, শোনেই বা কে? উনিই হচ্ছেন বাবুর ছোট জামাই আর কি!

যুবক চমকিয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল—ছোট জামাই!

নবীন যুবকের বিস্মিত মুখের পানে চাহিয়া বলিল, হ্যাঁ মশায়, চমকাচ্ছেন যে! এতে চম্‌কাবার কি আছে? ছোট জামাই মানে—ছোট মেয়ের স্বামী। রাঁধুনী বামুন থেকে একেবারে রাজ-জামাতা। বুঝলেন না?

ব্যাপারটা যে কি এবং কি করিয়া সম্ভব হইয়াছে বা হইবে, ইহা নবীন যুবককে ধরিয়া একটু শুনাইয়া গায়ের জালা কতকটা জুড়াইবে ভাবিতেছে, এমন সময় যুবক একবার বাড়ীখানার দিকে, একবার নবীনের দিকে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া উত্তেজিত ভাবে সে স্থান ত্যাগ করিল।

বাসায় আসিয়া যুবক কিছুদিন স্থিরভাবে চিন্তা করিতে লাগিল, এখন কি করা কর্ত্তব্য। যে লোক তাহাকে এ সকল কথা বলিল তাহার সত্যতা সম্বন্ধে তাহার কোনই সন্দেহ হইল না। লোকটি সম্ভবতঃ ভৃত্যই হইবে, তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত; তাহাকে মিথ্যা বলিয়া কোন লাভ নাই। বাকি সমস্ত সে নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

একবার ভাবিল, গৃহস্বামীর সহিত দেখা করিয়া কি সমস্ত কথা বলিয়া দিবে? কিন্তু বলিয়া দিলেই বা কি হইবে? কিছুই ত আর ফিরিবে না। ও কিছু আর শিশু নহে যে উহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে। ধরিয়া লইয়া গেলেও কিছু লাভ আছে কি না ভাবিবার বিষয়। যাহার জন্য এত চেষ্টা, তাহার সমস্ত শান্তি চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন বাকি রহিল উহাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া। কিন্তু কি পাষণ্ড! এই তাহার আত্মমর্য্যাদা, সত্যানুরাগ! এই তাহার সব!

কয়েক দিন পরেই যুবক দেশে রওনা হইল।

বলা বাহুল্য. এই যুবক বিজয়।

১৭

অপ্রত্যাশিত ভাবে এই সময়ে সত্যব্রতের কাছ হইতে দুইখানি পত্র আসিয়াছিল। একখানি পত্র উমার নামে, অপরখানি সারদাশঙ্করের নামে।

সত্যব্রত শ্বশুরকে লিখিয়াছে যে, সে তাঁহার আশীর্ব্বাদে গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়াছে। অনুমতি হইলে স্ত্রী-পুত্রকে লইয়া আসে।

উমাকে লিখিয়াছে যে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী একটী চাকরি পাইয়াছে। শ্বশুর মহাশয়ের কাছে অনুমতির জন্ম পত্র লিখিয়াছে। তাঁহার আদেশ পাইলে লইয়া আসিবে, কারণ স্ত্রী-পুত্রকে দেখিবার জন্ম তাহার মন বড় অধীর হইয়াছে।

তৎক্ষণাৎ সারদাশঙ্কর জবাব লিখিয়া দিলেন যে, সত্যব্রত যেন পত্রপাঠ চলিয়া আসে। সে আসিলেই সকল ব্যবস্থাই যথাযথ হইবে। চিঠিতে এ কথারও উল্লেখ রহিল যে, তাহাকে বহুদিন না দেখিয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলেই বড় কষ্টে আছে।

উমা উত্তর দিল, এতদিনে যে অভাগিনীকে মনে পড়িয়াছে, এই তাহার ভাগ্য। তুমি যখনি আমাকে লইতে আসিবে, যেখানে আমাকে লইয়া যাইবে, আমি যাইবার জন্ম সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি।

উমাদের বাড়ীতে একটী সাড়া পড়িয়া গেল। বাহিরে সবিশেষ সংবাদ রাষ্ট্র না হইলেও ভিতরের সবাই জানিল জামাই আসিতেছে। সারদাশঙ্কর একটু চিন্তায় পড়িলেন, সত্যব্রত যদি জিদ করে যে সে লইয়া যাইবে, তখন তিনি কি করিবেন? যদি সে বলিয়া বসে, না আমি আপনার বড় বাড়ী,

আপনার টাকা কড়ি, আপনার জমিদারীর অংশ চাহি না ; আমি শুধু আমার স্ত্রী ও পুত্রকে লইতে আসিয়াছি, আমাকে কেবল তাহাদিগকে লইয়া যাইতে দিন, তখন তিনি কি করিবেন ?

মনে মনে ভাবিয়া রাখিলেন, তিনি বলিবেন, যেমন এখানে ছিলে তেমনি থাক ; নয়তো তোমার পৃথক্ বাড়ী আছে সেখানে থাকিতে পার ; অন্যত্র যাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। ইহাতে যদি সে কথা না মানে, তখন তাহাকে যাহা খুসী করিতে দিবেন। অর্থ-সম্পত্তি এ সব না থাকিলেই আত্মীয়-স্বজনকে দেওয়া যায় না, থাকিলে দিবার জন্য লোকের ভাবনা হয় না।

এদিকে সারদাশঙ্করের আদেশে সত্যব্রতের বাসগৃহ নূতন হইলেও তাহার প্রসাধন আরম্ভ হইয়া গেল। মুখে কিছু না বলিলেও তিনি এ সব ব্যবস্থা করিলেন যাহাতে আর সকলে এবং সত্যব্রত ফিরিলে সে অভ্রান্তরূপে বুঝিতে পারে যে, পুরবাসী সকলে তাহার প্রত্যাগমনে উৎফুল্ল হইয়াছেন।

পত্রোত্তরে সত্যব্রতের কাছ হইতে তাহার আসিবার দিন নির্দিষ্ট করিয়া পত্র আসিল। এক সপ্তাহ পরে সত্যব্রত ফিরিবে।

কবে আসিবেন এই চিন্তার পরিবর্তে উমা সেই দিন হইতে দিন গণিতে আরম্ভ করিল। রমাসুন্দরী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। অরুণা উমাকে লইয়া পড়িল। অবহেলা ও সংস্কার অভাবে তাহার চুলে জটা বাঁধিয়া গিয়াছিল। অরুণা সেই দিনই অপরাহ্ণে উমার কেশ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইল।

অরুণা চুল আঁচড়াইয়া দিতে দিতে বলিল, কি মাথা করে রেখেছ ভাই! ঠাকুরজামাই এসে কি বল্‌বেন বল দেখি ? ভাববেন বাড়ীতে কেউ কি নাই যে মাথাটা বেঁধে দেয় !

উমা কিছু বলিল না ; একটু হাসিল মাত্র। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখে জল আসিল। অরুণা চোখ মুছাইয়া দিয়া বলিল, আর কান্না কেন ভাই ?

কান্নার দিন ত ভাই শেষ হ'ল। এখন একটু হাস। তোমার হাসিমুখ যে ভুলে গিয়েছি ভাই!

সমস্ত দিনটি উমার যেন সুখস্বপ্নে কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পরে খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। রাত্রে আহারাদির পর উমা যখন শয়ন করিতে গেল, ইচ্ছা হইল খোকার সঙ্গে ঐ সম্বন্ধে ২।১টি কথা বলে। কিন্তু খোকার যে অঘোর ঘুম, তাহাকে যদি উঠাইয়া কিছু বলা যায়! ২।১ বার খোকার মুখের উপরকার চুলগুলি সস্নেহে সরাইয়া দিয়া ডাকিল—ও খোকা, খোকা, একটা খবর বলি শোন্।

খোকার দুই চোখে এত ঘুম ভরা ছিল যে, সে কিছুতেই সাড়া দিল না। উমা এবার খোকার গা ঠেলিয়া ডাকিতে লাগিল, ও খোকা, খোকারে, সাত দিন পরে কে আসবেন বল দেখি?

খোকা ঘুমের মাঝে দুইবার নড়িয়া চড়িয়া, একবার হুঁ বলিয়া আবার তৎক্ষণাৎ গভীর ভাবে ঘুমাইয়া পড়িল।

উমার গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত কিছুতেই ঘুম আসিল না। অবশ্য নিদ্রার জন্য সে কোন চেষ্টাও করে নাই। সমস্ত ক্ষণ স্বামীর চিন্তাতেই বিভোর হইয়া ছিল। উমা ভাবিতেছিল, আচ্ছা তিনি এতদিন কেমন ছিলেন? শরীর ভাল ছিলো তো? কিন্তু মন? মন ভাল থাকিতেই পারে না। যখন তিনি আসিবেন সকলের সঙ্গে সে তো ছুটিয়া দেখিতে পারিবে না! আচ্ছা, সব চেয়ে যার দেখিবার বেশী আগ্রহ, সেই কেন পিছাইয়া থাকে? ইহা ভগবানের এক অতি আশ্চর্য্য বিধান। এ ঘর হইতে ত কিছুই দেখা যায় না! যাইলে দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া জানালা দিয়া সে নিশ্চয়ই দেখিত। হয় ত তিনি আসিতে আসিতে চোখ তুলিয়া দেখিতেন, হয় ত বা চোখোচোখি হইয়া যাইত। তা হউক, তাহাতে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত না।

উমা আবার ভাবিল, আচ্ছা তিনি কি আমার মত কষ্ট পাইতেছেন? বোধ হয়, না। পাইলে কি এত দিনের মধ্যে একবারও না আসিয়া পারিতেন? তাঁহার কাজ আছে, বিদ্যাচর্চ্চা আছে, বন্ধু-বান্ধব আছে, উন্নতির চিন্তা আছে; তিনি কেন আমার মত কেবল পথের দিকে চাহিয়া থাকিবেন?

শেষ রাত্রে খোকা একবার জাগিল। উমা তাহাকে তুলিয়া উঠাইয়া বসাইয়া বলিল, এবার কে আস্ছেন বল্ দেখি?

খোকা বলিল, কে মা?

ঘরের ভিতর তাহারা মাত্র দুই জন, শেষ রাত্রি, দুয়ার বন্ধ, বাহিরে সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন; তথাপি উমা চুপি চুপি বলিল, তোর বাবা আস্ছেন। বুঝেছিস্?

খোকা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে বুঝিয়াছে।

উমা আবার বলিল, তিনি তোর জন্য কত কি জিনিস আনবেন, কত কোলে নেবেন! বুঝলি? তুই যেন তাঁর উপর রাগ করিস্ নে। বাপের উপর রাগ করতে নেই। জানিস্ তো?

খোকা ঘাড় নাড়িয়া এ জ্ঞানও স্বীকার করিয়া লইল।

খোকা আবার পাছে ঘুমাইয়া পড়ে, এ জন্য উমা আবার ডাকিল, খোকা!

খোকা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, কি মা?

উমা বলিল, তুই যেন কাউকে বলিস্‌নে খোকা, যে আমি তোকে এ সব বলেছি।

খোকা ভরসা দিল, না, সে বলিবে না।

ঘুমে ক্রমে উমারও চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল। পুত্রকে কোলের কাছে সরাইয়া আনিয়া উমা পুত্রের সঙ্গে শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

স্বপ্নে দেখিল, সত্যব্রত বাহির হইতে তাহাদের ডাকিতেছেন, কাহারো উত্তর না পাইয়া সত্যব্রত মনের দুঃখে ফিরিয়া যাইতেছেন, এমন সময় উমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

বৈশাখের প্রভাত। আলোকে ঘর ভরিয়া গিয়াছে। শেষ রাত্রে একবার উঠিয়াছিল বলিয়া খোকাও তখন কোলের কাছে ঘুমাইয়া আছে।

উমা দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে অত সকালেও যেন কিসের একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে! অরুণার খোঁজে গিয়া দেখিল, মায়ের কাছে অরুণা দাঁড়াইয়া। উমাকে দেখিবামাত্র রমাসুন্দরী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন। উমা দেখিল, অরুণার চোখেও জল।

উমা ভয় পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি মা, কি হয়েছে?

রমাসুন্দরী কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিলেন, মা, তোর কপালে এ দুঃখ ছিল তা কোন দিন ভাবিনি।

উদ্বেগ ও আশঙ্কায় অধীর হইয়া উমা বলিল, কি হয়েছে মা, বল না? তোমার পায়ে পড়ি।

রমাসুন্দরী কন্যাকে বক্ষে টানিয়া বলিলেন, একটু আগে বিজয় ফিরেছে। খবর এনেছে, জামাই রাগের বশে আবার বিয়ে করেছেন!

বারেকের জন্য উমার মাথাটা ঘুরিয়া উঠিল। ক্ষণেকের জন্য সে বিহ্বল দৃষ্টিতে মায়ের পানে চাহিল। তারপর ভিতর হইতে শক্তি-প্রয়োগে আপনাকে সম্বরণ করিয়া লইল।

সে দিন সারদাশঙ্করের এক নূতন রূপ সকলে দেখিল। ক্রোধে, ঘৃণায় একটা সারদাশঙ্কর একেবারে যেন তিনটা হইলেন। সেদিনকার সেই অনাথ বালক, যাহাকে কৃপাপরবশ হইয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহাকে সর্ব্ব-বিষয়ে সুখী করিবার জন্য কোন ব্যবস্থার ত্রুটি করেন নাই, তাহার এই আচরণ! আবার একথা গোপন রাখিয়া উমাকে লইয়া যাইবার কথা তুলিয়াছে! উমাকে লইয়া গেলেই সেই সঙ্গে অর্থ-সম্পত্তিও পাইবে; কাজেই আজিকার দিনেও দুইটি স্ত্রী পুষিতে কোন কষ্ট হইবে না। পাষণ্ড, স্বার্থপর!—এই ভাবে তুমি গ্রাসাচ্ছাদনের যোগাড় করিয়াছ!

অকর্ম্মণ্য দেওয়ান; আজ পর্য্যন্ত একটা নিশ্চিত সংবাদ আনিতে পারিল না। অপ্রিয় হইলেও তবু সত্য সংবাদ বিজয় আনিয়াছে।

তৎক্ষণাৎ সত্যব্রতের বাড়ী তালাবদ্ধ হইয়া গেল। বাড়ীর ভিতর সর্ব্বত্র আদেশ দেওয়া হইল—আজি হইতে এ বাড়ীতে সত্যব্রতের প্রবেশ চিরতরে নিষিদ্ধ হইয়া গেল।

সত্যব্রতের কাছে এই মর্ম্মে পত্র চলিয়া গেল—তোমার নীচতা আমি জানিতে পারিয়াছি। তোমার মুখ আমি আর এ জীবনে দেখিতে চাহি না। তোমার সহিত সকল সম্বন্ধের শেষ হইয়াছে। এখানে আর কখন আসিবে না। আসিলে অপমানিত হইবে এবং লাঞ্ছিত হইয়া বিতাড়িত হইবে। ইতি—সারদাশঙ্কর।

রমাসুন্দরী একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করিতে তাঁহাকে সারদাশঙ্কর বলিয়া

দিলেন, আজ হতে মনে কোরো—তোমার উমা বিধবা। উমাকেও এ কথা বলে দিও।

রমাসুন্দরী উত্তরে কাঁদিয়া ভাসাইলেন। উমা শুনিয়া নির্ব্বাক গম্ভীর হইয়া রহিল।

সত্যব্রতের বসিবার ঘর বন্ধ করিয়া রাখা হইল। বাহিরের প্রকাণ্ড হলে সত্যব্রতের ফটো ছিল। সারদাশঙ্করের আদেশে তৎক্ষণাৎ তাহা সরাইয়া ফেলা হইল। পরিবারের অন্যান্য লোকের সঙ্গে তাহার যে ফটো ছিল, সেগুলিরও ঐ ব্যবস্থা হইল। দেখিয়া-শুনিয়া উমা তাহার নিজের কক্ষের স্বামীর ছবি দুইখানি নিজের বাক্সে কাপড়-জামার নীচে লুকাইয়া ফেলিল। সেখানে আর কেহ খানাতল্লাসী করিতে আসিল না।

প্রকাশ্যে সারদাশঙ্কর আদেশ দিয়া রাখিলেন, সত্যব্রত আসিলে তাহাকে গলায় হাত দিয়া যেন তাড়াইয়া দেওয়া হয়। যে না দিবে, তাহার চাকরি তো তুচ্ছ কথা—কাঁধে মাথাটি পর্য্যন্ত থাকিবে না। অসহ্য ক্রোধে সারদাশঙ্কর ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। তাঁহার কন্যা—আবার উমার মত সর্ব্বগুণে গুণবতী অসামান্যা সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার!

এক একবার মনে জাগিতেছে, কলিকাতা গিয়া বা লোক পাঠাইয়া তাহাকে ধরিয়া ইহার শাস্তি বিধান করিতে পারিলে, তবে ক্রোধের কিছু শান্তি হইতে পারে। কিন্তু সমস্ত মন ইহাতে সায় দিতেছিল না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, সে আসুক, আসিয়া এখানে দ্বারবানের হাতে ভৃত্যের হাতে লাঞ্ছিত হউক। তাঁহার অনুশোচনা হইতে লাগিল সত্যব্রতকে আসিতে তাড়াতাড়ি নিষেধ না করিলেই ভাল হইত। তাহার নীচ কার্য্যের প্রতিফল দিবার তবু একটা সুযোগ মিলিত।

উমা এই পত্রের কথা জানিত না। তাহার মনে ভয় হইতে লাগিল, যদি তিনি আসেন তাহা হইলে কি হইবে? তিনি যাহাই করুন, এখানে

আসিয়া অপমানিত হইয়া যাইবেন সে তাহা প্রাণ ধরিয়া সহ্য করিতে পারিবে না।

উমা ভাবিতে লাগিল, কিন্তু সত্যই কি তিনি বিবাহ করিয়াছেন! ইহা কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব?

মন উত্তর দিল, সম্ভব তো নয়; কিন্তু রাগে মানুষে কি না করিতে পারে? হয়ত তিনি রাগের বশে এইরূপ করিয়াছেন। রাগের কারণ যে ইঁহারাই দিয়াছেন। তখন তাঁহাকে বিনাদোষে অপমানিত করিয়া এখন এ সব লাঞ্ছনার ব্যবস্থা করিলে কি হইবে?

দুঃখের চেয়ে ভয় তাহার অধিক হইল। যদি তিনি আসিয়া পড়েন? আর যখন লিখিয়াছেন, আসিয়া তো পড়িবেনই। তখন কি হইবে? উমা অতি গোপনে চিঠি লিখিতে বসিল। কত কথাই মনে জাগিল! বেদনা ও অভিমান, লেখনীর গতিরোধ করিয়া রাখিল। কোন্ কথাটি রাখিয়া কোন্ কথাটি বলিবে? চারি পাঁচখানি পত্র দু'চার ছত্র করিয়া লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। কোন খানাই তাহার মনোমত হইল না। শেষে অতি ক্ষুদ্র এক পত্র লিখিল :—

শ্রীচরণেষু,

আসিও না, কিছুতে আসিও না। আর আসিবার প্রয়োজন নাই। আমার যাওয়া হইবে না।—উমা।

চিঠি লিখিয়া খামে আঁটিয়া উমা অতি গোপনে তাহা ডাকে পাঠাইয়া দিল। তারপর ঘরে দুয়ার বন্ধ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, তুমি কি করিয়াছ, তাহা ঠিক জানি না। কেন করিয়াছ তাহাও জানি না। কিন্তু আমি যে তোমাকে আসিতে বাধা দিলাম—এ দুঃখ আমি কেমন করিয়া ভুলিব?

১৯

নিত্যধন সূর্য্যপ্রকাশকে বলিল, আপনি রান্নার তো অন্য ব্যবস্থা করেছেন ; কিন্তু আমায় এখনো তো কোন কাজ দিলেন না ?

সূর্য্যপ্রকাশ বলিলেন, তোমায় তো আমি পূর্ব্বেই সেক্রেটারির কাজ দিয়াছি। এখানকার সেক্রেটারি বল, ম্যানেজার বল—সবই তুমি।

নিত্যধন বলিল, কিন্তু কি করতে হবে তাতো বুঝতে পারছিনে। আপনার ঘর-সংসার দেখা-শোনাতে অল্প সময়ই কাটবে। বাকি সময়টুকু আমি কি করব ?

সূর্য্যপ্রকাশ। দরকার পড়্‌লেই তোমার কাজ বাড়্‌বে। ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? এখানে কাজ কম মনে কর, তোমাকে আমি মাঝে মাঝে দেশে পাঠাব ; সেখানে দেখ্‌বে কাজের সমুদ্র।

নিত্যধন। বেশ তো, আপনি তাহলে আমাকে সেখানেই পাঠিয়ে দিন্ না। আমি একটু আপনার সত্যিকারের কাজ করবার অবকাশ পাই।

সূর্য্যপ্রকাশ। তুমি সম্প্রতি যে সত্যিকারের কাজ করেছ, তাতে আমার জীবন ভর তোমাকে আর কোন কাজ করতে দেওয়া উচিত নয়। আমি তোমাকে পুরস্কার হিসাবে কিছু দিতে গিয়ে দেখেছি তুমি তাতে ক্ষুণ্ণ হও, সেজন্য আমি সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি। তোমার ইচ্ছা, তুমি যে কাজ করবে শুধু তারই পারিশ্রমিক নেবে ; কাজেই তোমাকে বেতন হিসাবে কিছু বেশী করে দিয়েছি।

নিত্যধন। আমি ২৫৲ টাকায় কাজ সুরু করেছিলাম; আপনি ২৫৲ টাকা থেকে ২২৫৲ টাকা করে দিলেন। 'কিছু বেশীই' বটে! আপনি যেমন দয়া ও স্নেহ-বশতঃ না চাইতে বেতন বাড়িয়ে দিয়েছেন, আমারও এটুকু দেখা দরকার যে আমিও আপনার তদনুরূপ সেবা করতে পারি।

সূর্য্য। মাঝে মাঝে তোমাকে দেশে পাঠাতেই হবে। এখানে কিছু-দিন তোমাকে রাখা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দেখ, নিত্য, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।

নিত্য। কি কথা বলুন?

সূর্য্য। তুমি কি শুধু এণ্ট্রান্স পাশ, না আরও কিছু পড়া আছে? আমার জিজ্ঞাসার কারণ এই যে, সেই হিসেবে তোমার কাজ আমি বাড়িয়ে দিতে পারব।

নিত্য। কিছু বেশী পড়া আছে।

সূর্য্য। কোন পর্য্যন্ত তুমি পড়াতে পার মনে কর?

নিত্য। এফ্, এ পর্য্যন্ত পড়াতে পারি, বোধ হয়।

সূর্য্য। বেশ তাহলেই হ'ল। বিভার তো ছুটি হবে এখনি, এখন থেকে তুমিই বিভাকে একটু করে বাড়ীতে পড়াও। এতে তোমার কোন আপত্তি নেই তো?

নিত্য। আপনি আমায় যে কাজ করতে বল্‌বেন তাই আমি যথাসাধ্য করব। কোন কাজে আমার কোন আপত্তি নেই।

সূর্য্য। বিভাকে তুমি কাল থেকে এক ঘণ্টা করে আমার সাম্‌নের এই ঘরে পড়াবে। তারপরেই তুমি এই ঘরে আস্‌বে; আমি এইখানে থাক্‌ব এবং তুমি এলেই—তোমাকে লেখবার পড়বার কিছু কিছু কাজ রোজ দেব।

নিত্য। যে আজ্ঞে।

সূর্য্য। আর একটি কথা নিত্য। এ বাড়ীর অপর অংশটি তোমার। এ অংশ একেবারে পৃথক্। এ তুমি আজ থেকে ব্যবহার করবে। তোমার কেউ আছেন কি না—আমি জিজ্ঞাসা করছি না। যদি কেউ থাকেন বা ভবিষ্যতে কেউ হন্, এ বাড়ী তুমি তোমার আপনার বাড়ী বলে গ্রহণ করবে। তাহলে তোমার নিজস্ব বলে একটা সময় থাক্‌বে। তুমি অধিক পরিচয় দেওনি বা দিতে অনিচ্ছুক। তার জন্য তুমি সঙ্কোচ কোরো না। তোমার যে পরিচয় আমি পেয়েছি, তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

নিত্য। আমার পরিচয় বিশেষ কিছু নয়। আপনি যে মুহূর্ত্তে যা জান্‌তে চাইবেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাই আপনাকে বল্‌ব। আপনার দেওয়া পৃথক্ বাসা আমি দরকার হলেই গ্রহণ করব। আপনার নিজের কোন একটা কাজের ভার যদি আমাকে দয়া করে দেন।

সূর্য্য। আমার পড়ার ইচ্ছা এখনো মেটেনি। অথচ বেশী পড়া ডাক্তারের নিষেধ। তুমি রোজ একটু একটু করে পড়ে আমাকে শুনিও। আমি সাহিত্যের বড় পক্ষপাতী। তুমি প্রতিদিন খানিকটে করে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পড়ে আমাকে শুনিও। কোন কোন বই আমি তোমাকে পছন্দ করে দেব, তুমি তার সারাংশ আমাকে শুনিও। যেখানে যেখানে তার ভাষা ও ভাব ভাল, তাও পড়িয়ে শোনাবে—যাতে অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে আমি যথাসম্ভব জান্‌তে এবং শিখ্‌তে পারি। বিভার উপরেও এ ভার একটু আছে। দুজনে আমাকে যদি সাহায্য কর, যাবার আগে আরো কিছু শিখে যেতে পার্‌ব। সময়ও তো এদিকে আমার বড় কম।...এবারে নিত্য, কাজ তোমার যথেষ্ট—হয়েছে তো?

নিত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ, কিছু বেড়েছে। আমি প্রাণপণে এ কাজ ভাল ভাবে করবার চেষ্টা করব।

নিত্যধন চলিয়া গেল। সূর্য্যপ্রকাশ তখন বিভাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। একটু পরেই বিভা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি বলছ বাবা?

সূর্য্যপ্রকাশ কন্যাকে বসিতে বলিয়া বলিলেন, নিত্যধনের সঙ্গে কথা কইছিলাম, মা! ওর কাছে আমি বড় কৃতজ্ঞ। প্রভার অবস্থার জন্য আমি নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত ছিলাম। দুঃখে অনুতাপে একেবারে যেন অমানুষ হয়ে যাচ্ছিলাম। এখন কি করে নিত্যর কিছু উপকার করি বল তো?

বিভা বলিল, আমি তো এ সম্বন্ধে ভাল করে ভেবে দেখিনি, বাবা। ভেবে দেখে আর একদিন বলব।

সূর্য্যপ্রকাশ বলিলেন, সেই ভাল কথা, মা, ভেবেই বোলো। আমি তো বলেছি—কাল থেকে আমাদের বাড়ীর ঐ অংশটি নিত্য ব্যবহার করবে। ও তো প্রথমে রাজী হয় না। শেষে অনেক বলা-কওয়ায় এক রকম রাজী হয়েছে। কিন্তু বলেছে ওকে আরও বেশী কাজ দিতে হবে। আমার মনে হয়, ও লেখাপড়া বেশ ভাল রকমই জানে। কেবল এনট্রান্স পাশ নয়। তোমার কি মনে হয়?

বিভা। আমারও তাই মনে হয়, বাবা। উনি বোধ হয় বিশেষ পণ্ডিত লোক।

সূর্য্য। আমি জিজ্ঞাসা করায় স্বীকার করেছে ও এনট্রান্সের চেয়ে বেশী জানে আর এফ্ এ ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়াতে পারে। আমি ওর কথা বিশ্বাস করেছি এবং ব্যবস্থা করেছি যে, তোমাকে রোজ এই সামনের ঘরে বসে একঘণ্টা পড়াবে। হ্যাঁ, দেখ, তোমার উপর আমি একটা কাজের ভার দিতে চাই। নিত্যকে যে অংশটি পৃথক্ করে দিলাম, সেটি

সাজাবার ভার তোমার। যা দরকার, নিজে পছন্দ করে জিনিস কিনে আন্‌বে। সমস্ত ঘরগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা কর্‌বে; কিন্তু দুটি ঘর বেশ ভাল করে সাজিয়ে রাখতে ভুলো না; একটি বস্‌বার ঘর, একটি শোবার ঘর।

এ কার্য্যভার, মনে হইল, বিভা বেশ প্রসন্নচিত্তেই গ্রহণ করিল।

অপরাহ্নে নিত্যধন দুই দিনের জন্য অবকাশ চাহিল। বহুদিন কোথাও সে যায় নাই; একবার পুরাতন পরিচিতদের সহিত দেখা করিয়া আসিবে! ফিরিয়া আসিয়া—নূতন কার্য্যভার গ্রহণ করিবে।

বিভা লক্ষ্য করিতেছিল, কয়দিন হইতে দুপুরের দিকে নিত্যধন একবার বাহিরে যায়। ফিরিয়া আসে ঘণ্টা দুই পরে।

পরদিন সে কেমন উন্মনা হইয়া রহিল। দুপুরের দিকে সেদিনও বাহিরে গেল।

বিভা একবার কি ভাবিয়া নিত্যধনের কক্ষে আসিল। একবার দেখিয়া লইল এ ঘর হইতে কোন্ কোন্ জিনিস অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে হইবে! একবার ভাবিল এ ঘরটির কিছু সে গুছাইয়া দিতে পারে কি না। লক্ষ্য করিয়া দেখিল, কিছুই অগোছাল নাই। ক্ষণেকের জন্য মনে হইল, পুরুষ মানুষের এতটা গোছালো হওয়া ভাল নহে। একটা কৌতূহল জন্মিল নিত্যধনের পুরাতন জীবন জানিবার কোন উপাদান কি এই ঘরের মধ্যে মিলিতে পারে না? বালিশটি একবার উঠাইল। নীচে চাবি মিলিল। বোধ হয় বাক্সের।

বিভা এক মুহূর্ত্ত ভাবিল। তারপর চাবি লইয়া বাক্স খুলিল। বাক্সে খান পাঁচেক বই। ১খানি ইংরাজী দর্শনের, ১খানি উপন্যাসের, ১খানি সংস্কৃত দর্শনের, ১খানি বাঙ্গালা বই, আর ১খানি মূল ফরাসীতে লেখা উপন্যাস।

বই কয়খানি নাড়িয়া চাড়িয়াই বিভা বুঝিল, নিত্যধন নিশ্চয়ই সামান্ত লোক নহে। তাহার মনে এক অকারণ পুলক জাগিল। সে যেন একান্ত-মনে ইহাই কামনা করিতেছিল। বই কয়খানি রাখিতে যাইবে এমন সময় এক পাশে দুইখানি চিঠি দেখিতে পাইল। চিঠি দুইখানি হাতে লইয়া সবিস্ময়ে শিরোনামা দেখিল :

শ্রীযুক্ত সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়।

C/o. Postmaster, Amherst Street P. O.
Calcutta.

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিভা একখানি চিঠি খুলিয়া পড়িল। চিঠিখানির লেখক সারদাশঙ্কর। তিনি লিখিতেছেন, তাঁহারা সকলেই বড় দুঃখে আছেন। সত্যব্রত যেন শীঘ্র ফিরিয়া আসেন। আসিলেই লইয়া যাওয়া সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইবে।

তবে তো নিত্যধনের আত্মীয় আপনার জন আছেন! বিভা একটু ক্ষুণ্ণ না হইয়া পারিল না। নিত্যধন যেমন বলিয়াছিল, তাহার যদি সত্যই কেহ না থাকিত, বিভা যেন তাহাতেই অধিকতর আনন্দ পাইত।

অপর পত্রখানিও বিভা সন্তর্পণে খুলিয়া পড়িল। নারীহস্তের লেখা। এক নিঃশ্বাসে চিঠিখানি সে পড়িয়া ফেলিল। লেখিকা উমা। সে লিখিয়াছে যে, সে সত্যব্রতের সঙ্গে সর্ব্বত্র যাইতে সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত।

বিভা ভাবিল, সামান্ত কয়টি কথা। কিন্তু ইহাতেই একখানি বৃহৎ গ্রন্থের কথা বলা হইয়া গিয়াছে। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে চিঠিখানি খামের মধ্যে ভরিয়া রাখিল। চিঠি দুইখানি যেমন ছিল তেমনি রাখিয়া দিল। ক্ষণপরে আবার উমার লেখা পত্রখানি বাহির করিল। আবার সেখানি পড়িল। খানিকক্ষণ খোলা চিঠিখানির দিকে চাহিয়া কি ভাবিল। আবার

সেখানি খামে ভরিয়া রাখিয়া দিল। তারপর বাক্স বন্ধ করিয়া রাখিয়া চাবি যথাস্থানে রাখিয়া দিল এবং ধীরে ধীরে কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

অপরাহ্ণে যখন নিত্যধন ফিরিল, তখন বিভা তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিল। নিত্যধন যেন অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া ফিরিয়াছে।

কোন একটা দুঃসংবাদ পাইলে মানুষের যেমন অবস্থা হয়, এও সেইরূপ। চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই তাহার ছুটিতে দেশে যাইবার কথা। তাহার পরদিনই সে সূর্য্যপ্রকাশকে বলিল, তাহার আর ছুটির প্রয়োজন হইবে না এবং সেই দিন হইতেই সে বিভাকে পড়াইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

বিভা বিস্মিত হইল। ইহারই মধ্যে আবার কি এমন ঘটিল, যাহার জন্য নিত্যধনের সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল? অনেক কথাই মনে হইল। কিন্তু কোনটিই মনোমত হইল না। বিভা ভাবিল, আচ্ছা, এমন কি হইতে পারে যে নিত্যধনের এখানকার জীবন ভাল লাগিয়াছে, তাই এখান হইতে যাওয়ার বা কাহাকেও লইয়া আসা সে পছন্দ করিতেছে না। ইহাতে মনে একটু আনন্দ পাইল দেখিয়া বিভা নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হইল।

দুপুরে নিত্যধন বাহির হইবামাত্র বিভা আবার তাহার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবার তাহাকে বিশেষ গোপনেও আসিতে হইল না। কারণ, পিতার কাছ হইতে সে নিত্যধনের কক্ষ গুছাইয়া দিবার ভার পাইয়াছে। কে যেন তাহাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিত্য-ধনের কক্ষে টানিয়া লইয়া গেল। আবার সে চাবি লইয়া বাক্স খুলিল। দুইখানি নূতন চিঠি পাইল। একখানি সারদাশঙ্করের, অপরখানি উমার। সারদাশঙ্কর তাহাকে তিরস্কার করিয়া আসিতে নিষেধ করিয়াছেন। উমাও খুব সংক্ষেপে ও ব্যগ্রভাবে যাইতে মানা করিয়াছে। সারদাশঙ্করের নিষেধ সে একপ্রকার বুঝিতে পারিল। উমার নিষেধের কারণ সে ঠিক বুঝিল না। সারদাশঙ্করের পত্রে নিত্যধনের বিরুদ্ধে

সুস্পষ্ট অভিযোগ না থাকিলেও তাহার একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। উমার পত্রে কিছুই ছিল না।

উমার দুইছত্রে কাতর অনুরোধ, মর্ম্মান্তিক অভিমান কি ঈর্ষ্যা লুকানো আছে তাহা বুঝিবার উপায় ছিল না। বিভা উমার চিঠিখানি হাতে করিয়া ভাবিতে লাগিল, ইহার পশ্চাতে অশ্রুর বন্যা না অভিমানের বিদ্যুৎ আছে? না, স্বামীকে কোন বিপদ, কোন অপমান, কোন কঠিন তিরস্কার হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই আত্ম-বলিদান? কি এমন ঘটিল যাহার জন্য হঠাৎ সব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল? এখানে থাকার জন্য কি কোন কথা রটিয়াছে? যদি রটিয়া থাকে, তাহার জন্য কে দায়ী? কাহার প্রসঙ্গ লইয়া সে কথা?

উমার চিঠিখানি বিভা আর একবার ভাল করিয়া পড়িল। চিঠির প্রত্যেক কথাটি তাহার মনে গাঁথিয়া গেল। তারপর বিভা চিঠি রাখিয়া দিয়া বাক্স বন্ধ করিল ও অনেক কিছু ভাবিতে ভাবিতে আপন কক্ষে ফিরিয়া আসিল।

১৯

নিত্যধন পড়াইতে আরম্ভ করিল। বিভা তাহার অধ্যাপনার মাধুর্য্য, উপযোগিতা ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহাদের কলেজে খুব কম অধ্যাপকই অমন সুন্দর করিয়া পড়াইতে পারেন।

পাশেই সূর্য্যপ্রকাশের সুনির্ব্বাচিত পুস্তকের সংগ্রহ। মাঝে মাত্র একটি দুয়ারের ব্যবধান।

কোন একটি সুন্দর কবিতা পড়াইতে গিয়া সে-ভাবের অপর কবির কবিতা বাহির করিয়া শুনাইয়া বুঝাইয়া, তবে তাহার কর্ত্তব্যের শেষ হইত।

Dora কবিতার শেষ ছত্র But Dora lived unmarried till her death পড়াইবার সময় নিত্যধনের গলা ধরিয়া আসিত। ডোরার প্রেম, তাহার উদারতা, তাহার কঠিন ব্যথা, গভীর দুঃখ, মূর্ত্তি ধরিয়া সম্মুখে উদিত হইত। নিত্যধন বলিত, এই একটি গাথা, যাহা গদ্যে বড় করিয়া লিখিলে এক সুন্দর সুবৃহৎ উপন্যাস রচিত হইতে পারিত।

টেনিসনের Crossing the Bar পড়াইতে গিয়া যুগযুগান্ত ধরিয়া মানবাত্মার পরমাত্মায় বিলীন হইবার আগ্রহ নিত্যধনের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিত। পরপারের অভ্রান্ত আহ্বান কি করিয়া কবির কাণে পৌঁছিয়াছিল ও কেমন করিয়া পূর্ব্ব হইতে তিনি প্রস্তুত হইয়া ছিলেন, তাহার কাহিনী বড়ই মনোরম লাগিত।

Sunset, and evening star,
And one clear call for me.
And may there be no moaning of the bar,
When I put out to sea!

পড়িতে পড়িতে বিভার মনে হইত যেদিন কবির দেহতরী সত্যসত্যই সম্মুখের প্রসারিত অনন্ত নীল সমুদ্রে মিলিয়াছিল, তখন না জানি কি গভীর শান্তি কবি লাভ করিয়াছিলেন!

একদা বাংলা দেশের কবি নিত্যকৃষ্ণও অন্তরে পরপারের আহ্বান অনুভব করিয়া ঐরূপ একটি কবিতা মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে সেই কবিতাটি—এক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা শুনিয়া বিভা বিস্মিত হইল।

সম্মুখে প্রসারিত অনন্ত অম্বুধি, শত শত বলিষ্ঠ বাহুর মত অগণিত

ঊর্ম্মির আঘাতে সেই প্রশান্ত বক্ষ চঞ্চল ও শব্দ-মুখর। পারের সম্বল-হীন কবি তীরে দাঁড়াইয়া সম্মুখে প্রসারিত সমুদ্র দেখিয়া ভাবিতেছেন, কি করিয়া বিনা সম্বলে এই বিশাল সমুদ্র পার হইবেন!

সাত পাঁচ ভাবি শেষে পড়িনু ঝাঁপিয়া,
কহিনু সান্ত্বনা-স্বরে মনেরে ডাকিয়া,—
আর বৃথা পরিতাপে কি হইবে ভাই,
অকূল পাথারে এযে যা করে গোঁসাই।

কোন্‌খানে দুই লেখার সাদৃশ্য, কোথায় তাহার স্বাতন্ত্র্য, বিভা নিজেই তাহা বুঝিয়া আনন্দ লাভ করিল।

সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের রঘুবংশ পড়াইতে গিয়া কোন কোন স্থানে বাল্মীকির রামায়ণে রঘুবংশের যত বর্ণনা আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া সেটুকু বাহির করিয়া শুনাইয়া বুঝাইয়া নিত্যধন তাহার অধ্যয়নকে মধুর ও জ্ঞানগর্ভ করিয়া তুলিত।

নিত্যধন যখন সূর্য্যপ্রকাশকে লঘু সাহিত্যের সারাংশ শুনাইতে আসিল, তিনি দেখিলেন, উক্ত সাহিত্যের অধিকাংশ পুস্তকই তাহার পূর্ব্ব হইতে অধীত। সংস্কৃত পুরাণাদিতেও তাহার অসামান্য অধিকার আছে এবং যাহা সে না জানে, তাহা রাত্রে অধ্যয়ন করিয়া পরদিন প্রস্তুত হইয়া আসিত। সূর্য্যপ্রকাশ বুঝিলেন, হয় সে অসামান্য শক্তির অধিকারী, নয় তো সে বিশেষ পণ্ডিতলোক। নিত্যধন তাহার গত জীবনের কোন কথাই আপনা হইতে বলিত না; সূর্য্যপ্রকাশও তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল দেখাইতেন না। মানুষের অতীত জীবন তাহার নিজের, তাহার বর্ত্তমান অপরের। অতীতে যদি ভুলভ্রান্তি, কলঙ্ক-অগৌরব, দোষগ্লানি কিছু থাকে, তাহা থাকুক; তাহার উপর সে যে বর্ত্তমানের নির্ম্মল সুন্দর সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাই সকলের বিচার্য্য।

সূর্য্যপ্রকাশ সামাজিক সভায় গতায়াত করিতেন। অবরোধ-প্রথা যাহাতে ধীরে ধীরে উঠিয়া যায় এবং স্ত্রীজাতি যাহাতে অবাধ বায়ু ও আলোক বিনা বিপদে সেবন করিতে পারে, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। এ বিষয়ে তিনি কিছু কিছু লিখিতেন ও বলিতেন। নারী-জাতির মধ্যে যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগের অতিমাত্রায় প্রসার দেখিয়া যখন চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞদিগের মতামত ঘোষিত হইল যে, অবরোধে বাস ও উপযুক্ত খাদ্যের অভাব এই রোগাদির জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী, তখন ইহা দূরীকরণের জন্য যে চেষ্টা চলিয়াছিল, তাহাতে তিনি সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করেন। ইহা লইয়া এক মহতী সভার আহ্বান হইলে সূর্য্যপ্রকাশই সভা-পতি হইবেন স্থির হইল।

সূর্য্যপ্রকাশ বলিলেন, নিত্য, অবরোধ-প্রথা যতদূর সম্ভব শিথিল করা সম্বন্ধে আমার যে যুক্তি তোমাকে বলি, তুমি সে সব নিয়ে এবং তোমার যুক্তি-তর্ক দিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখে দাও। এই অবরোধ-প্রথার জন্য আমার স্ত্রীর অকালে মৃত্যু হয়। আমাদের পৈতৃক বাড়ীতে জীবন ধারণের উপ-যোগী যত রকম মূল্যবান্ সুবিধা হতে পারে, প্রায় সে সমস্ত জিনিসের ব্যবস্থা ছিল। ছিল না কেবল ভগবানের অজস্র অমূল্য দান আলো ও বাতাসের প্রাচুর্য্য। প্রতিদিন তিল তিল করে স্বর্ণ-পিঞ্জরের মধ্যে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। আমাদের বংশের নিয়ম, আভিজাত্যের গৌরব, সমাজের বিধি—সব মিলে আমায় কর্ত্তব্যে বাধা দিলে। আমি কর্ত্তব্য কি, তা বুঝেও পিছিয়ে গেলাম এং আমার স্ত্রীকে আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হতে দিলাম। তাঁর মৃত্যুকালের কয়েকটি কথায় আমি কর্ত্তব্যের শক্তি পেলাম। যাদের অর্থ-সম্পত্তি আছে, তাদের সংসারে যদি মেয়েদের এমন অবস্থা হয়, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সংসারে কি হয় তা ভাবতে গেলে হৃৎকম্প হয়। সেখানে আলো নাই, বাতাস নাই, খাদ্য

নাই, বিশ্রাম নাই, আশা-ভরসা কিছুই নাই। পিঞ্জর-হিসাবে দুইই সমান—একটা সোণার, অপরটা লোহার—এই প্রভেদ। যাতে অবরোধ-প্রথা দূর হয় অথচ আমাদের সমাজের কোন অকল্যাণ না হয়ে শুধু কল্যাণই সাধিত হয়, আমি তাই চাই। সেজন্য আমি বলি, তাদের তুমি সব জায়গায় নিয়ে যাও আর নাই যাও, তোমার বাড়ীর বাহিরের খোলা জায়গায়, নদীর ঘাটে, দেবালয়ে তাদের যেন যাবার কোন বাধা থাকে না। আমি মেয়েদের নিয়ে বেড়াতে যাই তো নিজের গাড়ীতে যাই, আমার গাড়ীর চালক বিশ্বাসী, চরিত্রবান্ ও বলবান্। আমিও একেবারে দুর্ব্বল নই, তাছাড়া এখনও কুস্তির প্যাঁচ কিছু কিছু মনে আছে, রিভলভারও একটা বাইরে গেলেই সঙ্গে থাকে। তবু এক-একবার মনে হয়—বিপদের ভয় একেবারে নেই, তা নয়; অথচ বিপদের ভয়ে একেবারে কাউকে পিঞ্জরের মধ্যে রাখাও চল্‌বে না। কি করে সাবধানতার সঙ্গে আমরা অবরোধ-প্রথা ধীরে ধীরে ত্যাগ কর্‌তে পারি, তারই উপায় বার কর্‌তে হবে!

নিত্যধন বলিল, সহরেই এ সম্বন্ধে বেশী ব্যবস্থার দরকার। পল্লী-গ্রামের মধ্যে আগে এ সবের কোন ব্যবস্থারই প্রয়োজন ছিল না। সেখানে এবাড়ী থেকে ওবাড়ী মধ্যবিত্ত ঘরের সকলেই যেতেন। সহরের মত পার্কের সৃষ্টিরও দরকার ছিল না। কারণ, প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর সঙ্গে একটু করে বাগান থাক্‌তই। পল্লীগ্রামে এ গুলির নূতন প্রচলনের প্রয়োজন, অর্থাৎ পল্লীতে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন।

সূর্য্য। এ সব ঠিক। কিন্তু এ বিষয়ে বাধা জন্মেছে—যেদিন হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-বৃক্ষ নূতন করে গজিয়েছে।

নিত্য। সে তো বাইরে বেরুনোর জন্য নয়। ঘরের মধ্যে থেকেও যে মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে! তা বলে বাক্সে—সেও লোহার বাক্সে, বন্ধ করে রাখাও অসম্ভব। কাজেই আমার মনে হয়, প্রথমতঃ পল্লীর পূর্ব্বা-

বস্থাকে ফিরিয়া আনা প্রয়োজন। বড় সহরে পুরুষদের আস্‌তেই হবে; কারণ, সেটা তাদের কার্য্যক্ষেত্র। কিন্তু পল্লীতেও ফিরতে হবে, কারণ, সেটা বাসভূমি। পল্লী বা সহরে বাইরে বেরুতেও শিখতে হবে, কিন্তু সেটা সাহস ও সাবধানতার সহিত। সাহসের সঙ্গে শক্তির প্রয়োজন। যেমন মনের শক্তি চাই, তেমনি শরীরের শক্তিরও দরকার। তার জন্য চর্চ্চা চাই।

সূর্য্যপ্রকাশ। অবরোধকে আমি খারাপ বলি এই জন্য যে, এতে করে শরীর ও মন দুইই দুর্ব্বল হয়ে যাচ্ছে।...পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের মেলা-মেশার সুবিধা হচ্ছে না এ জন্য যে অবরোধের বিলোপ প্রয়োজন, তা আমি মনে করিনে; কিন্তু অন্য পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা হয়ে যায় এই ভয়ে অবরোধকে রক্ষা করতে হবে এটাও ঠিক নয়।

নিত্যধন। আমি আপনার কথা বুঝেছি। আপনি সংস্কার চান্ কিন্তু উগ্রপন্থী নন্। স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত না হয়, এইটুকুই আপনি ইচ্ছা করেন।

সূর্য্য। মেয়েদের স্বাস্থ্যের জন্য প্রচুর আলো-বাতাস ও শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন;—খাদ্য তো আছেই। আর মনের স্বাস্থ্যের জন্য সুশিক্ষার প্রয়োজন। সেকালে আমাদের হিন্দু-সমাজে লেখাপড়া না শিখেও বা অতি সামান্য শিখেও মেয়েদের প্রকৃত শিক্ষার অভাব হ'ত না। পিতামাতারা ধর্ম্ম আচরণ করে পুত্র-কন্যাদের শিক্ষা দিতেন। গ্রামে গ্রামে রামায়ণ গান, কথকতা, পুরাণাদি পাঠ এত বেশী পরিমাণে হ'ত যে, শুধু স্ত্রীলোকের কেন পুরুষদেরও প্রকৃত শিক্ষা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যেত। এখন সে সব প্রায় উঠে গেছে। এখন তারা বিদ্যালয়ে পড়্‌তে না পেলে সর্ব্ব-বিষয়েই অশিক্ষিত রয়ে যাবে। কাজেই শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন এবং সেজন্য অল্প-বিস্তর বাইরে যেতে হবে। আমাদের দেশের

সাধারণ হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এই যে, পুরুষেরা বাগানের গাছ। তারা আর কিছু না পাক্—মুক্ত আলো ও বাতাস পাচ্ছে। আর মেয়েরা যেন টবের মধ্যেকার গাছ; স্বল্প মাটি, স্বল্প আলো, ও স্বল্প বাতাস সম্বল করে, ঘরের দুয়ারে বা বড় জোর বারান্দায় থাকতে পারে।

আর খানিকটা আলোচনার পর নিত্যধন উঠিয়া গেল।

পরদিন নিত্যধনের লিখিত অভিভাষণটি সবিস্তারে শুনিয়া সূর্য্য-প্রকাশ মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন, তোমার লেখার অসামান্য ক্ষমতা। অতি সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ হয়েছে। আর এত ভাল হয়েছে যে, এটি তোমাকে তোমার নামে ছাপাতে না দিয়ে, অভিভাষণ হিসাবে আমার পড়াটা যেন অন্যায় হবে বলে মনে হচ্ছে।

নিত্যধন বলিল, আপনার এতখানি মনে করার কোন কারণ নাই। প্রধানতঃ আপনার যুক্তির উপর নির্ভর করেই তো আমি এই প্রবন্ধ লিখেছি।...

নির্দ্দিষ্ট দিনে সভাপতির অভিভাষণে সবাই মুগ্ধ হইয়া গেল।

সভায় সূর্য্যপ্রকাশের পার্শ্বে বিভাও উপস্থিত ছিল। নিত্যধন ইচ্ছা করিয়াই যায় নাই। সভা-সমিতি ও বিশেষ প্রকাশ্য স্থান হইতে সে আপনাকে সন্তর্পণে দূরে রাখিত।

সন্ধ্যা হইতে সামান্য মাত্র দেরী। বঙ্গদেশের গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ বড়ই মনোরম! মানুষের মনকে গৃহের কোণ হইতে একটু দূরে টানিয়া আনেই। তথাপি নিত্যধন এখনও ঘরের মধ্যে। সভা হইতে ফিরিয়া বিভা বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন না করিয়াই নিত্যধনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে

গেল। দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া বিভা দেখিল, নিত্যধন একখানি খোলা চিঠির উপর দৃষ্টি রাখিয়া শয্যায় শুইয়া আছে। বিভা অনুমান করিল, চিঠিখানি তাহার সেদিনকার পঠিত পুরাতন চিঠি। কিন্তু তাহাই পড়িতে নিত্যধন এতই তন্ময় হইয়াছিল যে, কক্ষমধ্যে বিভার আবির্ভাব সে জানিতেও পারিল না। বিভার যেন মনে হইল, নিত্যধনের চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

বিভা বিস্মিত ও ব্যথিত হইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, নিত্যদা!

নিত্যধন চমকিত হইয়া মুখ তুলিল। দূর হইতে বিভাকে দেখিয়া চিঠিখানি বন্ধ করিতে করিতে উঠিয়া বসিয়া বলিল, কে বিভা? এস, ভিতরে এস।

বিভা ঘরের মধ্যে আসিয়া একটা আসনে বসিল। নিত্যধনের দিকে চাহিয়া দেখিল সে অত্যন্ত ক্লিষ্ট ও পরিশ্রান্ত।

বিভা বলিল নিত্যদা, তোমাকে আজ বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে, শরীর ভাল আছে তো?

নিত্যধন মৃদু হাসিল। বলিল, শরীর তো ভালই আছে; তোমার একথা মনে হল কেন? জান ত আমার দুঃখ বা আনন্দ দেবার লোক খুব কমই আছে। আমি বৌদ্ধমতের প্রায় নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত। সুখ-দুঃখের প্রায় অতীত।

বিভা একটু ক্ষুন্ন হইয়া বলিল, তুমি আমাদের সুখ-দুঃখ নিজের বলে নিয়েছ; কিন্তু তোমার দুঃখের কোন কথাই আমাদের কাউকে বল না।

বিভার ক্ষুণ্ণস্বর নিত্যধনকে বিঁধিল। সে বলিল, বিভা, তুমি দুঃখ ক'র না। তোমাদের কাছে থেকে অনেক পেয়েছি। তোমরা আমায় আশ্রয় দিয়েছ; মানুষকে যত রকমে সুখে ও শান্তিতে রাখা সম্ভব, তা

রেখেছ। এ সত্ত্বেও যদি আমার কোন দুঃখ রয়ে যায়, জেনো সে দুঃখ সান্ত্বনা ও প্রতিকারের অতীত। পৃথিবীতে এত দুঃখ এত ব্যথা আছে যে, তার তুলনায় আমাদের এ সব সৌখীন দুঃখ কিছুই নয়।...তোমরা কখন ফিরলে? সভা কেমন হ'ল?

বিভা উত্তর করিল, ভালই। তোমার লেখাটি বড়ই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। সকলেরই সেটা ভাল লেগেছিল। বিশেষতঃ লেখার অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে। ফিরে আসবার সময় বাবা বলেছিলেন, তোমার প্রাপ্য প্রশংসাটা আজ তিনিই নিয়ে নিলেন।

নিত্য। আমাকে তিনি বেশী ভালবাসেন বলেই—এ রকম বলেছিলেন। নইলে, ভাব-ভাষা সবই তাঁর নিজের: আমি কেবল গুছিয়ে একত্র করে দিয়েছি এই মাত্র।

বিভা। তুমি তো নিজের সম্বন্ধে প্রথম থেকেই উদাসীন। অথচ আমাদের সর্ব্বকর্ম্মে তুমি সহায়তা করছ। তোমাকে বল্‌লাম দিদির এই রকম অবস্থায় তুমি একটু দেখ, দিদির দুঃখ যদি দূর হয়। তুমি অমনি বকুল-দীঘি ছুট্‌লে; দিদিকে সেখানে পৌছে দিয়ে, তার সব দুঃখ দূর করে তবে ফিরে এলে। আমার অনুরোধে তুমি এতখানি কর্‌লে; কিন্তু তোমার দুঃখ কি যখন জান্‌তে চাইলাম, তুমি কিছুতে বল্লে না। এটা কি তোমার উচিত নিত্যদা?

নিত্যধন বলিল, এর জন্য তুমি কোন দুঃখ ক'রো না, বিভা! আমার জীবনের বেশী কিছু বলবার নেই! আমি এখানে বড় সুখেই আছি: তোমাদেরই সংসারের আজ আমি একজন। তোমরা সুখে থাক্‌লেই আমি সুখী।

বিভা ম্লান মুখে বলিল, তুমি যাই বল না কেন, নিত্যদা, আমার মন এ কথায় তৃপ্ত হচ্ছে না। আমার কেবলি মনে হয়—তোমার যা পরিচয়

আমরা পেয়েছি, তার চেয়ে তুমি অনেক বড়। তোমার অনিচ্ছায় তোমার কাছ থেকে কথা বা'র করে নেব, এ আমার দুরাশা। তুমি যেটুকু বলেছ বা বল্‌বে, তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট হতে হবে। তুমি যা বল্‌লে না, জান্‌ব, তা শোনবার আমার অধিকার নেই।

অকস্মাৎ নিত্যধনের মুখে একটি যন্ত্রণার আভাষ ফুটিয়া উঠিল। বিভা বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া নিত্যধনের ললাটের উপর আপনার ডান্ হাত রাখিয়াই আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল, নিত্যদা, তোমার এত জ্বর! গা পুড়ে যাচ্ছে; আর তুমি বল্লে, ভাল আছ!...

বিভা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর তাহার অশ্রু-সজল নয়ন যেন অশ্রুভারে নত হইয়া নিত্যধনের ললাট অর্দ্ধস্পর্শ করিয়া সিক্ত করিয়া দিল। পরমুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া নারীর সহজাত মমতায় কণ্ঠ ভরিয়া বলিল, নিত্যদা, তুমি শান্ত হও। তোমার প্রকৃত দুঃখ জানবার অধিকার না দাও, দিও না। কিন্তু নিজের দুঃখকে আর বাড়িও না।

তারপর সমস্ত কুণ্ঠা দূর করিয়া নিত্যধনের অশ্রু মুছাইয়া দিয়া নিজের অশ্রু মুছিয়া ফেলিল।—সহসা দুইটি মনুষ্য-মূর্ত্তির ছায়া গৃহমধ্যে পতিত হইল। একজন বলিয়া উঠিল, একি, তুমি এখানে বিভা! আমরা যে তোমার জন্য খুঁজে খুঁজে হয়রাণ! ও কে?...মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া বিভা শান্ত ও সমাহিত ভাবে বলিল, ইনি আমাদের নিত্যদা।

প্রশ্নকর্ত্তা একটু রুক্ষস্বরে বলিল, ও—! যাক্...কাকা তোমাকে ডাক্‌ছেন। উনি না হয় একটু একাই থাক্‌লেন।

বিভা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, আপনারা এগোন। ওঁর জ্বর হয়েছে, আমি একটু পরে যাব।

অবরোধ-প্রথা-বিরোধের সভায় একটি ছোট ঘটনা ঘটিয়াছিল। যখন বক্তারা অবরোধ-প্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন, সভাপতির পার্শ্বে উপবিষ্টা বিভার দিকে এক যুবক একদৃষ্টে তাকাইয়াছিল।

সেই যুবকের কাছে আর এক যুবক বসিয়া ছিল। সভাভঙ্গের পরই যখন চারিদিকে কলরব উঠিয়াছিল তখন পূর্ব্বোক্ত তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি-ধারী যুবক তাহার সঙ্গীকে বলিল, এই তো বিভা ?...আজই আমায় ওখানে নিয়ে যাওয়া চাই।

সঙ্গী বলিল, আমি তো তোমাকে কত আগে থেকে বল্‌ছি—তোমারি তো বার হচ্ছে না।

যুবক বলিল, এবার থেকে আর বার বন্ধ হবে না; দিন-রাত খোলাই থাক্‌বে। আমি কি জানি ছাই, যে, ও এই রকম মারাত্মক-গোছের সুন্দর হয়ে উঠেছে! আজ এখনই চল ভাই! অবরোধ-প্রথার বিরুদ্ধে এত করে বলে, সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো আর রত্নকে বাক্সবন্দী করতে পারবে না।

সঙ্গী বলিল, সেই ভাল। তবে আমার কথাও মনে রেখো। খুড়োর কাছে দুমুঠো ভাত ছাড়া আর কিছুরই প্রত্যাশা নাই। আধা-আধি সম্পত্তির বখরা যেন ভুলো না।

যুবক বলিল, নিশ্চয়ই। Word of honour তোমাকে দিচ্ছি, তুমি নিশ্চিন্ত থেক। এখন তুমি এই চেষ্টা কেবল কর, যাতে আমি বিভারত্ন লাভ করতে পারি। অন্য রত্নে আমার লোভ নেই।

প্রথম যুবকের নাম অনঙ্গমোহন। তাহার সঙ্গীর নাম বিকাশ,—দূর-সম্পর্কে সূর্য্যপ্রকাশের ভ্রাতুষ্পুত্র। অনঙ্গমোহন তাহার বন্ধু। বিকাশের সঙ্গে সে বারকয়েক তাহাদের দেশে ও কলিকাতায় বিভাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল। সেই সময় হইতে বিভার রূপ ও বিভার পিতার বিত্তের উপর তাহার লোভ জাগিয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরেই এক স্থলভ স্থযোগ পাইয়া বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া আসে। এক ভদ্রলোক অনঙ্গের কথার উপর নির্ভর করিয়া যে সে ফিরিয়া আসিয়াই তাঁহার শ্যামবর্ণা কন্যাকে বিবাহ করিবে—এই ভরসায় নিজের খরচে তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। অনঙ্গ কিন্তু পাশ করিয়া আসিয়া বুদ্ধিমানের মত বাঁকিয়া বসিল। শ্যামবর্ণার চেয়ে গৌরবর্ণার দিকেই তাহার বেশী ঝোঁক চাপিল। বিভার কথা তাহার মনে ছিল, কিন্তু পুরাপুরি সাহস ছিল না। এমন সময় বিভাকে দেখিয়া লোভ দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। দুই বন্ধু যুক্তি করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সেখানে পৌছিল।

বিকাশকে দেখিয়া সূর্য্যপ্রকাশ বলিলেন, বিকাশ যে, আয়! সব ভাল তো? আজকাল আর মোটেই আসিস না যে?

বিকাশ ক্ষোভ দেখাইয়া বলিল, যতদিন কাকীমা ছিলেন, আস্‌তে কত ইচ্ছে কর্‌ত! তিনি গিয়ে পর্য্যন্ত আর আসতেই ভাল লাগে না. আপনিও একটু উদাসীন গোছের থাকেন।

সূর্য্যপ্রকাশকে জয় করিবার উপায়—তাঁহাকে প্রকারান্তরে নিন্দা করিয়া তাঁহার স্ত্রীর প্রশংসা করিতে হইবে; তাহা হইলেই তিনি একেবারে জল!

এক্ষেত্রেও অভীপ্সিত ফল ফলিল। সূর্য্যপ্রকাশ স্নেহস্বরে বলিলেন, তাঁর মত তোদের আর কে যত্ন কর্‌বে বল্? তা বলে কি তোরা আমাকে পরিত্যাগ কর্‌বি?…ইনি কে?

বিকাশ হাসিয়া বলিল, আমার বন্ধু অনঙ্গমোহন। সম্প্রতি ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরেছে। আপনার আজকের অভিভাষণটি ওর বড় ভাল লেগেছে। তাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। আপনার বুঝি অনঙ্গকে একেবারেই মনে নেই? ওকে নিয়ে আমি কতবার এখানে এসেছি, খেয়ে গেছি—

সূর্য্যপ্রকাশ বলিলেন, তা হবে। আর কি সব মনে থাকে, বিকাশ! পথ প্রায় শেষ করে এনেছি।···প্রভার ব্যবস্থা হয়ে গেছে, সে সুখে আছে। এখন বিভার একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত।

বিকাশ মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে বলিল, বিভার জন্য আপনার কোন চিন্তা নেই। ওর জন্য সুপাত্রের অভাব হবে না।···বিভা গেল কোথায়?

সূর্য্যপ্রকাশ বলিলেন, ভিতরে কোথায় আছে।

পরে অন্তঃপুর হইতে তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন।

সংবাদ আসিল, বিভাদিদি এখনও অন্তঃপুরে যান নাই। বোধ হয় ছোটবাবুকে ডাকিতে গিয়া থাকিবেন।

বিকাশ জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কে?

সূর্য্যপ্রকাশ প্রসন্নতার সহিত বলিলেন, সেই-ই আজকাল আমার সেক্রেটারী। সে-ই সব দেখে শোনে। নাম নিত্যধন। যাও না, এই সিঁড়িটা দিয়ে উপরে যাও। নিশ্চয়ই তারা নিত্যর লাইব্রেরি-ঘরে বসে আছে। আলাপ করে বড় আনন্দ পাবে। সে আমার কাছে শ্রীভগবানের দান। এই বয়সে সে-ই আমাকে শান্তি দিয়েছে।

ছোটবাবু-রূপে আবার কে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল, ভাবিতে ভাবিতে দুই বন্ধু উপরে উঠিয়া আসিল। আসিয়া যাহা প্রত্যক্ষ করিল, কল্পনা ও বাস্তব একত্র করিয়া তাহা দুজনেরই কাছে প্রায় অনতিক্রমণীয় বাধা বলিয়া মনে হইল।

বিভা আসিয়া সংবাদ দিল—নিত্যধনের শরীর অসুস্থ, জ্বর হইয়াছে।

সূর্য্যপ্রকাশ উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, তাহলে তাকে উপরে একা রেখে এলে কেন? সঙ্গে করে কেন ডেকে আনলে না? এই সামনের ঘরেই তার বিছানার ব্যবস্থা করে ডাকতে পাঠাও।

বিভা বলিল, নিত্যদা বল্লেন তিনি একটু পরে আসবেন।

সূর্য্যপ্রকাশ অনঙ্গমোহনকে দেখাইয়া বলিলেন, বিকাশের সঙ্গে এঁকে তুমি দেখে থাকবে বোধহয়?

বিভা চাহিয়া দেখিল মাত্র। খানিক পরে নিত্যধন নামিয়া আসিল। সূর্য্যপ্রকাশ তাহাকে কাছে বসাইয়া গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, তোমাকে তো বলেছিলাম, অতবেশী পরিশ্রম কোরো না; তুমি তা কিছুতে শুনলে না। কেবল 'কাজ দিন, কাজ দিন,' করতে লাগলে, আমিও তেমনি দিলাম।...যাও, তুমি আর বসে থেকো না। ঐ ঘরে তোমার বিছানা করা আছে, শোওগে।

নিত্যধন বলিল, শরীরটা সামান্য খারাপ হয়েছিল; ও কিছু নয়। বিভা বুঝি এসে ভয়ানক করে কিছু বলেছে? বিভা মুখ ভার করিয়া বলিল, আমি না হয় বাড়িয়েই বল্লাম। আপনার গায়ের উত্তাপটাও বোধ হয় আমি বলতে বেড়ে গেল? সূর্য্যপ্রকাশ বলিলেন, যাও বাবা, আর কথায় কাজ নেই। চুপচাপ শুয়ে থাকগে। নিত্য বলিল, আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না। এঁরা এসেছেন, এঁদের সঙ্গে আলাপ করে যাই।

বিকাশ ও অনঙ্গ দেখিল, লোকটি এখানে প্রায় শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে। উহাকে এখান হইতে সরানো বড়ই কঠিন। সে চেষ্টা করিতে হইলে আরও পূর্ব্বে আসার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অনঙ্গ সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে। সে তৎক্ষণাৎ মনে মনে স্থির করিল, ইহাকে কিঞ্চিৎ জব্দ

করা বিশেষ প্রয়োজন। সে সূর্য্যপ্রকাশের পানে চাহিয়া বলিল, ইনিই বুঝি আপনার সেই ম্যানেজার? কত করে দিতে হয়, একশ? অনঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল।

নিত্যধন কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সূর্য্যপ্রকাশ বলিলেন, না, উনি আড়াইশো পান, যদিও এর চেয়ে ঢের বেশী মাইনের উনি উপযুক্ত।

নিত্যধন হাসিয়া বলিল, আপনি কিন্তু এই মাইনে থেকে আমার গুণের পরিমাণ ঠিক করবেন না। ক'মাস আগে আমার মাইনে ২৫৲ ছিল। আমি যা পাই সেটা আমার গুণের পরিচয় নয়, ওঁর দয়ার পরিচয়।

অনঙ্গ কথাটা লুফিয়া লইয়া বলিল, দয়া তো বটেই! ২৫৲ টাকা থেকে ২৫০৲ টাকা—a big jump! বাংলায় যাকে বলে লম্বা লাফ!

নিত্যধন বলিল, লম্বা লাফের চেয়ে আমার অবস্থাটা আরও সুস্পষ্ট হবে, যদি বলেন—'আঙুল ফুলে কলাগাছ।'

মনে মনে চটিয়া গিয়া অনঙ্গমোহন বলিল, English idiomatic expressions যেমন সহজে মনে আসে, বাংলা তেমন আসে না। English Societyতে দীর্ঘকাল বাস করার জন্য এটা আরও বেশী হয়েছে। বাংলা যেন একটু চেষ্টা করে মনে আনতে হয়।

বিকাশ বলিল, যারা ইংরাজী ভাল জানে, তাদের পক্ষে এটা যেন স্বাভাবিক।

বিভা বলিল, পঞ্চাশ বছর আগে আপনার এ-কথা বলা সাজত। উকিল, ব্যারিষ্টার, ডেপুটি, মুন্সেফ, অধ্যাপক, শিক্ষক, এঁরাই তো আজকাল বাংলার বড় বড় লেখক। তাঁরা যদি ইংরিজী শিখেই বাংলা ভুলে যেতেন, তাহলে বাংলাভাষা এখনো সেকেলে পণ্ডিতী ভাষাই রয়ে যেত। সে ভাষায় আর সাহিত্য গড়ে উঠত না।

অনঙ্গমোহন বলিল, বাংলা লেখাটা যেন আজকাল একটা ফ্যাশান দাঁড়িয়েছে :—যেমন খদ্দরের পোষাক। আগে এমন ছিল না।

নিত্যধন বলিল, তাই বা কি করে বলা যায়! মাইকেল মধুসূদনের ইংরিজী জ্ঞান তো অসাধারণ ছিল; আর কবিতাও তিনি প্রথমে ইংরিজীতে রচনা করেছিলেন। শেষে কিন্তু তাঁকে মাতৃভাষাতেই ফিরে আসতে হয়েছিল। আর এসেছিলেন তাই অমর হয়ে আছেন।

দুই দিক্ হইতে ধাক্কা খাইয়া অনঙ্গ আরও চটিয়া গেল: একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আপনার বাংলা জ্ঞান দেখ্ছি মন্দ নয়। কলা-গাছের কথাটা বেশ appropriate, অর্থাৎ ইয়ে—

বিকাশ কথাটা যোগাইয়া দিয়া বলিল, উপযোগী।

অনঙ্গমোহন জিজ্ঞাসা করিল, যখন আপনি ২৫৲ টাকা করে পেতেন তখনও কি ম্যানেজার ছিলেন?

নিত্যধন বলিল, তখন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ছিলাম। Manager in chief ছিলাম না।

অনঙ্গমোহন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করিল, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মানে? এঁর কোনও ব্রাঞ্চ ষ্টেটের ম্যানেজার নাকি?

নিত্যধন বলিল, আজ্ঞে না, তখন ছিলাম এই বাড়ীরই একটা অংশের বা খণ্ডের ম্যানেজার।

অনঙ্গ। কোন্ খণ্ডের?

নিত্যধন। রন্ধন-খণ্ডের।

অনঙ্গ। তার মানে?

নিত্য। রন্ধন-খণ্ডের ম্যানেজার মানে—manager of the kitchen, অর্থাৎ রান্নাগৃহের কর্ত্তা, অর্থাৎ রন্ধন-কর্ত্তা বা পাচক।

বিকাশ। অর্থাৎ আপনি রাঁধতেন?

অনঙ্গ। রাঁধতেন! By Jove! It is so funny! এ তো বড় মজার কথা!

নিত্য। এবারকারের অনুবাদ বেশ ভালো হয়েছে, আপনার ইংরিজী জ্ঞান সত্বেও।

অনঙ্গ। Thank you. আমি আপনার certificate চাইছিনে। আমি যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব পেলেই বাধিত হ'ব। No compliments please.

বিভা। এতে আপনার বিশেষ অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পাচ্ছে। আপনি ওঁকে ক্রমাগত জেরা করে যাচ্ছেন যেন আপনি হাকিম বা উকিল আর উনি আসামী বা সাক্ষী। এতখানি খবরে আপনার কি দরকার ছিল? তার উপর মাইনে এখন কত, তখন কত ছিল,--এত কথায় তো দরকার ছিল না।

সূর্য্যপ্রকাশ অনেকটা কৈফিয়ৎ-স্বরূপ বলিলেন, আমি রান্না কাজটিকে মোটেই ছোট মনে করিনে। ওটা যে কতবড় দায়িত্বের কাজ, তা আজকাল সাধারণ লোকের বুদ্ধির অগম্য। আমাদের সমাজে একাজ বরাবর বাড়ীর মেয়েরাই করে এসেছেন। বড় বড় ভোজেও মেয়েদের হাতের রান্না সবাইকে খেতে হ'ত। আজকাল কিন্তু রন্ধন জিনিষটা আমাদের দেশে একেবারে অজ্ঞাত। তাই আমি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, একজন ভদ্রবংশের Matriculation বা Entrance পাশ পাচকের প্রয়োজন। তাতে যত লোক এসেছিলেন, তার মধ্যে নিত্যধনকে আমি পছন্দ করেছিলাম। রান্নাঘর থেকে নিত্য আমাদের অনেক শিক্ষা দিয়েছেন। Dignity of labour, নিত্যধনের কাছ থেকে আমি শিখেছি! কার ভেতর কোন্ ক্ষমতা লুপ্ত থাকে, তাতো সব সময়ে জানা যায় না। জানলে আমাদের স্তম্ভিত হতে হয়। United

Statesএর অদ্ভুত ছুতোরের গল্প তো জান? সে অতি যত্ন, নিপুণতা ও অনুরাগের সহিত প্রেসিডেণ্টের আসন তৈরী করছিল এই ভেবে যে, সেও তো একদিন প্রেসিডেণ্ট হতে পারে, অর্থাৎ তাকেও তো একদিন ঐ আসনে বসতে হতে পারে। আর তার এই চিন্তা যে একদিন সফল হয়েছিল, তা তোমরা সবাই জান। তাহলেই দেখ, ছুতোর থেকে যদি প্রেসিডেণ্ট হতে পারে, [illegible] থেকে ম্যানেজার হতে বাধা কি?

অনঙ্গ বলিল, তাতো বটেই, নীচু অবস্থা থেকে উঁচু হওয়া প্রশংসারই বিষয়, নিন্দার নয়।

সূর্য্যপ্রকাশ বলিলেন, নিত্যধনের পড়াবার ক্ষমতা অদ্ভুত। বিভাকে একটু করে ইংরাজী ও সংস্কৃত পড়ায়। আমি সে পড়ানো শুনে মুগ্ধ হয়েছি।

অনঙ্গ বলিল, তা হয়। এক-একজন শিক্ষকের শক্তি নিয়েই জন্মায়। অল্প বিদ্যাতেই তারা ভাল পড়াতে পারে। পড়াবার ক্ষমতাই একটা আলাদা জিনিষ। সে জিনিষটা বিদ্যার উপর নির্ভর করে না।

বিভা এবার কথা কহিল, তা বলে কি আপনি বল্‌তে চান্ যে, যে বিষয় যিনি ভাল করে পড়াতে পারেন সেটা তিনি ভাল জানেন না, বা কম জানেন?

অনঙ্গ বলিল, এতো এঁকে দিয়েই দেখ্‌তে পাচ্ছেন। ইনি তো বেশী পাশ করেন নি? পড়াশোনাও সম্ভবতঃ বেশী নেই, অথচ পড়াতে পারেন ভালই শুন্‌ছি।

"আমার অনুপস্থিতিতেই এ সব আলোচনার বেশী সুবিধা হবে। আমি তাহলে উঠি। যদি বারান্তরে আসেন তো দেখা হবে।"

বলিয়া নিত্যধন উঠিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

নিত্যধন বাহিরে যাইতেই—বিকাশ জিজ্ঞাসা করিল, কাকা, এ ভদ্রলোকের আগেকার জীবনের কিছু সন্ধান নিয়েছিলেন কি? কোন দোষ নেই ত? আমার কেমন খট্‌কা লাগছে! যদি এতই ওঁর গুণ, ভাল চাকরি না নিয়ে রাঁধুনীর কাজ নিলেন কেন?

অনঙ্গ বলিল, হ্যাঁ, সেটা জানার বিশেষ প্রয়োজন। খোঁজ নিলে নিশ্চয়ই কিছু বেরিয়ে পড়তে পারে। অনেক সময় অত্যন্ত Undesirable antecedent জানা যায়, কিন্তু একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর। কাজেই সাবধানতা পূর্ব্বাহ্নেই দরকার।

সূর্য্যপ্রকাশ বলিলেন, প্রসঙ্গ বড় অপ্রিয় হ'য়ে উঠ্‌ছে। নিত্যধনের উপর আমার বিশ্বাস অগাধ। সে বিশ্বাস সহজে যাবে না। মানুষের যে পরিচয় আমরা জানতে পারি, তাও নিতান্ত বাইরের পরিচয়। তা থেকে ঠিক সত্যিকারের মানুষকে জানা যায় না। অমুক অমুকের পুত্র বা অমুকের অমুক জায়গায় বাড়ী—এ মানুষের ক্ষুদ্র পরিচয়। জানলে ক্ষতি নেই, না জান্‌লেও বিশেষ কিছু যায় আসে না। তার চেয়ে তার ব্যবহার কিছুদিন দেখে নিলে তার বেশী পরিচয়ই নেওয়া হ'ল।

সূর্য্যপ্রকাশের এই মতবাদ এবং নিত্যধনের উপর তাঁহার এতখানি বিশ্বাস কাহারও ভাল লাগিল না।

ততক্ষণে সন্ধ্যা নামিয়াছিল। দুইজনে জলযোগ করিয়া উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইল। সূর্য্যপ্রকাশ ভদ্রতার খাতিরে বলিলেন, আবার এস তোমরা।

অনঙ্গ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, আপনার সঙ্গে অনেক কাল পরে দেখা হয়ে বড় সৌভাগ্য বোধ কর্‌ছি। আপনার উপদেশ শুন্‌তে আমরা শীঘ্রই আস্‌ব।

দুজনেই উঠিয়া গেল। বিভা বিরক্তিপূর্ণস্বরে বলিল, হঠাৎ এঁদের আস্‌বার কি মতলব, বাবা?

সূর্যাপ্রকাশ বলিলেন, ওঁদের বুদ্ধি এত কম, মা, ওঁদের উদ্দেশ্য ধরতে বেশী দেরী হয় না।

বিভা একটু রাগত ভাবেই বলিল, এসে অবধি ওদের নিত্যদাদাকে আক্রমণ আমার বিসদৃশ লাগ ছিল।

সূর্য্যপ্রকাশ বলিলেন, এবার যখন আসবে তখন দেখো ওরা অন্য আলোচনা করবে! আর নিত্যধনের সঙ্গেই তখন ওদের গল্প করতে হবে।

পিতার কাছ হইতে উঠিয়া বিভার একবার নিত্যধনের সংবাদ লইতে ইচ্ছা হইল, তৎক্ষণাৎ পুরানো ঝিকে খবর লইতে পাঠাইয়া আপনার কক্ষে প্রবেশ করিল। ঝি আসিয়া বলিল, বাবু ঘুমুচ্ছেন।

আহারাদি করিয়া শয়নের পূর্ব্বে বিভার হঠাৎ মনে পড়িল নিত্য-ধনের চক্ষের দুই বিন্দু অশ্রু।

কিসের অশ্রু? কাহার জন্য সে অশ্রু? বিভা সে অশ্রু মুছাইয়া দিয়াছিল। বিভা ভাবিতে লাগিল, ঐ সুন্দর রক্তাধরে যাহাতে চির-দিনের জন্য হাসি ফুটিয়া থাকে, সে ব্যবস্থা বিভা কি করিতে পারে না?

ভাবিতে ভাবিতে এই সুখ-দুঃখ ভরা চিন্তার মাঝে বিভা ঘুমাইয়া পড়িল।

২১

ইহার পর হইতে অনঙ্গমোহন উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। তাহার আর্থিক অবস্থা মন্দ নয়। দেখিতে শুনিতেও ভাল। তাহার উপর বি, এ, বার-এট্‌-ল'। বয়সও অনুকূল, বংশও চলনসই।

পরদিন সে সোজা সূর্য্যপ্রকাশের সঙ্গে দেখা করিয়া বলিল, আমি বিভার পাণি-প্রার্থী। আপনি যদি দয়া করে সম্মতি দেন—

সূর্য্যপ্রকাশ বলিলেন, আচ্ছা আমি একথা ভেবে বা যদি সুবিধা হয় জেনে তোমাকে বল্‌ব। তুমি অযোগ্য পাত্র নও। তবে বিভারও জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে, ওর মতামতটাও আমার একটু জানা দরকার।

সূর্য্যপ্রকাশ এতদিন বিবাহের কথা বিশেষ করিয়া ভাবেন নাই। তাঁহার এক-একবার মনে হইত, প্রভার যেন সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে, এখনও বিভার বিবাহের বিলম্ব আছে। অনঙ্গমোহনের কথায় তাঁহার মনে হইল, এইবার তাহা হইলে বিভার বিবাহের চেষ্টা করিতে হয়। তবে বিভার জন্য যোগ্যপাত্র পাওয়া সময়-সাপেক্ষ, এইটুকুই প্রধান ভাবনা। যোগ্যপাত্র পাইলে বিবাহ দিতে আর দেরী কি? কিন্তু তারপর? একবার কি দুইবার মেয়ে পাঠাইতে দেরী হইলেই তো জামাতা রাগিয়া যাইবেন!...তাহারা কি জন্য ভাবিবে যে তাহাদের বৌয়ের বাপের সংসারে আর কেহ নাই! এই মেয়েদের মুখ চাহিয়াই বৃদ্ধ বাপ বাঁচিয়া আছেন! তাহার চেয়ে এমন ব্যবস্থা করিলে কেমন হয় যে, একটি দরিদ্র, সুন্দর, স্বাস্থ্যবান্, সুশিক্ষিত যুবক দেখিয়া তাহাকে পুত্রের মত কাছে রাখেন এবং তাহারই সঙ্গে বিভার বিবাহ দেন!

এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে নিত্যধনের কথা মনে পড়িল। তিনি নিত্যধনের গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে পুত্রের মত দেখিতে আরম্ভ করিলেন। সে জন্য বিভার সঙ্গে নিত্যধনের বিবাহের কথাটা তাঁহার মনেই আসে নাই। সে যে আসিয়া প্রথমে রন্ধন-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল, সেই জন্য এই কথাটা তাহার মনে উঠিবার অবকাশই পায় নাই। অথচ একথাটা তাঁহার আগেই মনে হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একটি বাধা, নিত্যধনের পূর্ব্ব-ইতিহাস তিনি একটুও জানেন না। সে বিবাহিত কি না স্পষ্ট ভাবে তাহাও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। সে সম্বন্ধে নিশ্চিত সংবাদ জানা প্রয়োজন।

পরদিন নিত্যধন যখন তাঁহার কাছে কর্ত্তব্যের জন্য আসিল, তিনি কিছুক্ষণ তাহার পাঠাদি শুনিবার পর বলিলেন, তোমাকে একটি কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই। তুমি আমার পুত্রের মত, আমার বিশেষ ইচ্ছা, তুমি আমারই কাছে আমারই চোখের সামনে সুখে সংসার কর। তুমি বিবাহিত কি না আজ পর্য্যন্ত আমি স্পষ্ট ভাবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। যদি তুমি বিবাহ করে থাক, আমাকে বল, আমি তোমার স্ত্রীকে কন্যার মত আদরে নিয়ে আসব। যদি বিবাহ না হয়ে থাকে, তাও বল। আমি উপযুক্ত পাত্রী দেখে তোমার বিবাহ দেব।

নিত্যধন বলিল, আমিও আজ এই সম্বন্ধেই আপনাকে বলব ভেবে-ছিলাম। আপনি আমার পিতার মত। আপনার কাছে অতি সামান্য কথাও গোপন রেখেছি সে জন্য মাঝে মাঝে অনুতাপ হয়। আমার প্রকৃত নাম সত্যব্রত। আমি বিবাহিত। কোন জমিদারের কন্যার সহিত আমার বিবাহ হয়। প্রচুর সম্পত্তিও তিনি আমার নামে দিয়েছিলেন। তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই আমি তত্ত্বাবধান করতাম। হঠাৎ এই তত্ত্বাবধান নিয়ে তাঁর পুত্রের সঙ্গে আমার মতদ্বৈধ হয়, তিনি পুত্রের পক্ষ সমর্থন করেন। আমি তার প্রতিবাদ করায় তিনি আমাকে তিরস্কার করেন।

তাঁর তিরস্কারে, আমার পৈতৃক আর্থিক অবস্থার প্রতি একটু ইঙ্গিত ছিল ; আমি সেই দিনই একা চলে আসি। বলে আসি, যতদিন না স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণের উপযুক্ত হতে পারি, ততদিন আর ফিরব না। এই কারণে তিনি রাগের বশে বলেছিলেন, তাঁর কন্যার উপযুক্ত ভরণ-পোষণ করতে না পারলে আমি যেন নিয়ে আসবার নাম না করি। তারপর আপনার এখানে এসে আশ্রয় পাই।

সূর্য্যপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁদের এতদিন খবর দাওনি বা তোমার স্ত্রীকে আননি কেন ?

নিত্যধন বলিল, যেদিন আপনি আমাকে ২৫০৲ বেতন করে দিলেন, তার পরেই আমি তাঁদের পত্র লিখি এবং তাঁদের পত্র পেলেই আনতে যাব তাও লিখি। উত্তরে তাঁরাও সাগ্রহে আমাকে যেতে লেখেন। তারপর আমি একেবারে দিন স্থির করে পত্র দিই। সে পত্রের উত্তর পেলাম অপ্রত্যাশিত রূপে কঠিন ও কর্কশ। তিনি লিখেছেন আমার গুণ তিনি সব টের পেয়েছেন। আমি যেন সেখানে না যাই।

সূর্য্যপ্রকাশ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্ত্রীকে কিছু লেখনি ?

নিত্যধন উদাস স্বরে কহিল, লিখেছিলাম। সেখান হতেও উত্তর আসে—আমি যেন না যাই। এর পর তো আমি আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। হঠাৎ কাল আমার স্ত্রীর এক পত্র পেলাম। নিয়ে আসবার জন্য এই পত্রে সাত্বনয় অনুরোধ আছে।

সূর্য্যপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন তুমি কি করবে ভাবছ ?

নিত্যধন বলিল, আমি আজই দিনস্থির করে চিঠি দেব।

সূর্য্যপ্রকাশ বলিলেন, তোমার শ্বশুরকে পত্র দিয়েছ ?

নিত্যধন বলিল, না, তাঁকে আর পত্র দেব না ভাবছি।

সূর্য্যপ্রকাশ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কেমন লোক?

নিত্যধন বলিল, লোক খুব ভাল। কেবল একটু বেশী জেদী। একবার কোন কথা কোন রকমে বিশ্বাস হলে সে বিশ্বাস দূর করা বড় কঠিন। আভিজাত্যের গৌরব একটু বেশী রাখেন।

সূর্য্যপ্রকাশ বলিলেন, এ গৌরব-বোধ আভিজাত্যের একটা অভিশাপ। আভিজাত্যের গুণ থাকবে অথচ তার গর্ব্ব থাকবে না এ দৃষ্টান্ত বিরল।

তারপর তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

মুহূর্ত্তের জন্য মনে হইল, তিনি যেন কিঞ্চিৎ আশাহত হইয়াছেন। তাঁহার সদাপ্রফুল্ল মুখ ক্ষণেকের জন্য ম্লান হইয়া আসিল।

নিত্যধন তাহা লক্ষ্য করিয়া ক্লিষ্ট কণ্ঠে কহিল, প্রথম থেকে একথা আপনাকে স্পষ্টভাবে বলিনি সে জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

সূর্য্যপ্রকাশ মুখে প্রফুল্লতা আনিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, না, না, এতে তোমার কোন দোষ নেই।

পরে উদাস মনে ধীরে ধীরে স্বগতোক্তির মত বলিলেন, তোমায় আরো আপনার করবার ইচ্ছা ছিল আমার। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। তবু তুমি আমার পুত্রোপম। যদি সম্ভব হয়, চিরকাল আমার কাছে পুত্রের মত থাক। আমার শেষ বয়সের সম্বল হও।

নিত্যধন নত হইয়া সূর্য্যপ্রকাশের পায়ের ধূলা লইয়া ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইবার জন্য উঠিল।

কিন্তু দুজনের একজনও জানিতে পারিলেন না, দুয়ারের আড়াল হইতে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন রোধ করিতে করিতে কে একজন নীরবে সরিয়া গেল।

আপনার কক্ষে বসিয়া বিভা সজলনয়নে লক্ষ্য করিল, নিত্যধন প্রথমে আপন কক্ষে গেল, সেখান হইতে বাহির হইয়া, উপরের বারান্দা পার হইয়া ধীরপদে সিঁড়ি দিয়া নীচে আসিয়া রাজপথে নামিল। তারপর দেখিল, নিত্যধন রাস্তা দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছে। বিভা বুঝিল, সে ডাকঘরের পথ ধরিয়াছে। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া—যতক্ষণ নিত্যধনকে দেখা যায় ততক্ষণ সে দেখিতে লাগিল। তারপর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আপন কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ভিতর দিয়া নিত্যধনের কক্ষে যাইবার যে সংক্ষিপ্ত পথ ছিল, সেই পথ ধরিয়া বিভা তাহার কক্ষে পৌঁছিল ও দুয়ার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

কক্ষটি পরিপাটি রূপে সজ্জিত। কোনখানে ময়লা জিনিসের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। তবুও বিভা আবার সব ঝাড়িয়া-মুছিয়া সাজাইল। শুভ্র শয্যার উপর একটি ভাঁজ পর্য্যন্ত পড়ে নাই! জামা-কাপড়গুলি সব অতি সাধারণ কিন্তু অতি শুভ্র ও পরিষ্কৃত অবস্থায় সজ্জিত। তবুও বিভা নিজহাতে একবার গুছাইয়া রাখিল। টেবিলের উপর দোয়াত, কলম, কাগজের টুকরাটি পর্য্যন্ত যথাস্থানে ঠিক করিয়া রাখিল। বইগুলি সব আপনার অঞ্চল দিয়া অতি যত্নে সমস্ত প্রাণ দিয়া ঝাড়িয়া-মুছিয়া রাখিল। তারপর ড্রয়ারের সম্মুখে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইল। একবার—দুইবার—তাহার বক্ষ দুলিয়া উঠিল। আপনার শঙ্কায়িত বক্ষকে শান্ত করিয়া সে ধীরে ধীরে ড্রয়ার খুলিল। ঐখানেই যে নিত্যধনের চিঠি থাকে তাহা বিভা জানিত। কম্পিত হস্তে সব উপরকার চিঠিখানি লইয়া সে শয্যার কাছে সরিয়া গেল। ততোধিক কম্পিত বক্ষে চিঠিখানি খুলিয়া—শয্যার উপর রাখিয়া সে পড়িতে লাগিল।

শ্রীচরণেষু,

আমার আগেকার পত্র পাইয়া আমার উপরে না জানি কত রাগ করিয়াছ, আমায় কত মন্দ ভাবিয়াছ! আমায় ক্ষমা কর। আমি না বুঝিয়া অমন লিখিয়াছিলাম। বাবা তোমার উপর হঠাৎ না বুঝিয়া অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন, তুমি নাকি কোন ধনীর ঘরে বিবাহ করিয়াছ। তুমি আসিলে পাছে তোমাকে কেহ কোন মন্দ কথা বলে, সেই ভয়ে আমি ব্যাকুল হইয়া তোমাকে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। তুমি আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিয়া ফিরিয়া এস। আমাকে এই অসহ্য ঐশ্বর্য্যের বোঝা হইতে লইয়া যাও। বালিকা-বয়সে যখন তোমাকে আমি চিনিতাম না পর্য্যন্ত, তখনই বহু বালক ও যুবকের মাঝখান হইতে স্বয়ম্বরা হইয়া তোমাকেই বরিয়া লইয়াছিলাম। আজ তোমাকে এমন করিয়া জানিবার পর, তোমার গভীর প্রেম লাভ করিবার পর, এখানকার তুচ্ছ অর্থ-সম্পদে কি আমি ক্ষণতরেও মগ্ন থাকিতে পারি? তুমি যে মুহূর্ত্তে আসিবে, সেই মুহূর্ত্তে আমি খোকার হাত ধরিয়া সব ফেলিয়া তোমাকে দ্বিতীয় বার সর্ব্বসমক্ষে বরণ করিয়া লইব। আমি তোমার আশাপথ চাহিয়া আছি,—কতক্ষণে তুমি আসিবে! যে ডাক সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ের মধ্যে শুনিতেছি, কতক্ষণে সেই সুমধুর ডাক আবার এই দুই কাণ ভরিয়া শুনিব! তুমি এস, এস। আর বিলম্ব করিও না। আর আমাকে দুঃখ দিও না।

তোমার চরণাশ্রয়-বঞ্চিতা

দাসী—উমা

একবার, দুইবার, তিনবার, বারবার বিভা সেই চিঠিখানি পড়িতে লাগিল। চিঠির মধ্যে বিভা তন্ময় হইয়া গেল। কল্পনায় সে দেখিল, সে-ই যেন উমা! এই চিঠি সে-ই লিখিয়া তাহার দয়িতের প্রত্যাশায় বসিয়া আছে! কতক্ষণে উত্তর আসিবে, কত দিনে দয়িত ফিরিবে! এই সুখভরা বিরহের কল্পনাতেই তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। ভাবিল, এই চিঠি দিয়া ভাগ্যবতী উমা নিত্যধনকে আহ্বান করিয়াছে। একদিন, দুইদিন, এক সপ্তাহ, নয় তো একমাস পরেও নিত্যধন ফিরিয়া যাইবে। হয় তো উমাকে লইয়া আসিবে, নয় তো বা সেখানেই থাকিয়া যাইবে। হয় তো আর সে নিত্যধনকে দেখিতে পাইবে না, আর তাহার নিকটে বসিবে না, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইবে না। এই শূন্য গৃহে, শূন্য কক্ষে, নিত্যধনের কয়েক মাসের স্মৃতি মাত্র সম্বল করিয়া তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কেমন করিয়া সে থাকিবে, কেমন করিয়া সে নিত্যধনকে ভুলিবে? তাহার সব চেয়ে বেশী দুঃখ এই যে, যাহাকে সে ভালবাসে তাহার জন্য প্রকাশ্যে অশ্রু ফেলিবারও বুঝি তাহার অধিকার নাই! মিলনে তো তাহার অধিকার নাই-ই, বিরহের অধিকার হইতেও সে বঞ্চিত। কাহাকে সে এই গভীর দুঃখের কথা বলিবে? কাহার কাছে কাঁদিয়া সে এই বিরাট দুঃখকে কথঞ্চিৎ সহনযোগ্য করিয়া তুলিবে?

বিভার বক্ষ এই কঠিন বেদনায় যেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। সেই নির্জ্জন কক্ষে শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িয়া সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া কহিল, তোমাকে ছাড়িয়া আমি কেমন করিয়া থাকিব? যদি থাকিবে না, যদি চলিয়াই যাইবে, কেন এমন করিয়া আসিয়া আমার সর্ব্বস্ব লইয়া গেলে? আমাকে একবার জানাইতে পর্য্যন্ত দিলে না যে তুমিই আমার সর্ব্বস্ব!

বিভা সেই শয্যার উপর লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার সুগন্ধি কেশরাশি ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশির মত শুভ্র উপাধান আবৃত করিয়া শয্যার উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। স্পন্দিত বক্ষ আবেগ ভরে যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল।

ঠিক সেই সময়ে দ্বারপথে পায়ের শব্দ হইল। আত্মহারা বিভা শুনিতে পাইল না। নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্ব্বে নিত্যধন আজ ফিরিয়া আসিয়াছিল।

দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া বিভাকে এই অবস্থায় কক্ষে দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। যাহা সে কোন দিন কল্পনাও করে নাই, তাহাই আজ প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ফারিত চক্ষে হতবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিভার মুখের স্বল্পোচ্চারিত বাণী সে শুনিল, তাহার যন্ত্রণাভরা অশ্রু সে স্বচক্ষে দেখিল। কিন্তু সান্ত্বনার কোন উপায়ই পাইল না। বিভার অগোচরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া আবার রাজপথে আসিয়া পৌঁছিল। উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে এখানে-ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া সন্ধ্যা উত্তীর্ণ করিয়া গৃহে ফিরিল। আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া আলোক জ্বালিয়া আপনার শয্যার পানে চাহিতেই মনে হইল—বিভার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের স্মৃতি, তাহার গভীর নিরুপায় দুঃখ, তাহার লুণ্ঠিত আশাহত মূর্ত্তি এখনও যেন শয্যার উপর অঙ্কিত রহিয়াছে!

সেইক্ষণ হইতে নিত্যধন,—আর নিত্যধন নহে, সত্যব্রত,—মনের শান্তি হারাইল। এ সে কি করিয়াছে? কেন সে প্রথম হইতে বলে নাই সে বিবাহিত, ঘরে তাহার প্রণয়িনী স্ত্রী রহিয়াছে? যিনি তাহাকে দুর্দ্দিনে আশ্রয় দিয়াছিলেন, ভৃত্য হইতে যিনি তাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার আদরিণী কন্যার জীবনে একি দুর্ভাগ্য সে আনিয়া দিল?

ভালবাসা ভালবাসাকে প্রবুদ্ধ করে। তোমাকে একজন গোপনে ভালবাসিতেছে উহা জানিতে পারিলে, সেই একজনের প্রতি তোমার মন স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইবে। কিন্তু তোমার সংস্কার, তোমার পূর্ব্বলব্ধ অচঞ্চল প্রেম, তুমি আকৃষ্ট হইলেও, তোমাকে সংযত করিতে পারে।

সত্যব্রতের নির্ম্মল দয়ার্দ্র কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হৃদয়ে বিভার জন্য দারুণ ব্যথা জাগিল। বিভার ইচ্ছায় ও বিভারই চেষ্টায় সে প্রভার জীবনে সার্থকতা আনিয়া দিতে পারিয়াছিল। কিন্তু বিভার জীবনের আসন্ন বিফলতাকে সে কি করিয়া দূর করিবে আজ? সত্যব্রত ভাবিয়া দেখিল, যদি সে বিভার মনে কোন পরিবর্ত্তন না আনিতে পারে, তাহা হইলে তাহার এখানে আর বেশীদিন থাকা সম্ভব হইবে না। উমাকে লইয়া এখানে আসা আর তাহার উচিত হইবে কি না, তাহাও ভাবিবার বিষয়। হয়ত তাহা বিভার অধিকতর কষ্টের কারণ হইবে।

আরও দুইদিন পরে তাহার কিশোরগঞ্জে ফিরিবার কথা। যদি তাহার এখানে ফিরিয়া আসা সম্ভব বা উচিত না হয়, তাহা হইলে আবার নূতন আশ্রয়ের প্রয়োজন। এতদিন অজ্ঞাতবাসের প্রয়োজন ছিল, এখন সে প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। এখন প্রকাশ্যেই কোন কলেজে একটা অধ্যাপকের কাজ লইতে হইবে। সে যে কলেজে পড়িত, তাহার পুরাতন অধ্যক্ষ এখনও সেই কলেজেই আছেন। সত্যব্রত অনতিবিলম্বে অধ্যক্ষের সহিত দেখা করিল। তখনকার দিনে সেইই কলেজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র ছিল। তাহার সেই সময়কার খ্যাতি, ইংরাজী ও বাংলা লেখা প্রবন্ধরাজি এখনও কলেজের গৌরব বলিয়া ভাণ্ডারে রক্ষিত আছে।

সত্যব্রতকে দেখিবামাত্র অধ্যক্ষের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সত্যব্রত ভূমিষ্ঠ হইয়া গুরুপদে প্রণাম করিতে তিনি তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া হাত ধরিয়া উঠাইয়া, পিঠ চাপড়াইয়া

সস্নেহে ও সাগ্রহে বলিলেন, সত্যব্রত ! বহু বহু কাল পরে তোমায় দেখলাম। আজকাল গুরুর সাক্ষাৎ সুলভ, ছাত্রের দর্শন দুর্লভ।

সত্যব্রত হাত জোড় করিয়া বলিল, ছাত্র চিরদিনই অপরাধী, গুরু তাকে মার্জ্জনা না করলে কে করবেন ?

সত্যব্রতের চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। অধ্যক্ষ তাহার পিঠে হাত রাখিয়া স্নেহভরে বলিলেন, তোমাদের দেখলে বড় আনন্দ পাই সত্য ! মনে হয় যেন আমার জীবনের গৌরব মূর্ত্তি ধরে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে যে কি আনন্দ, তা এখনও তোমরা বুঝবে না।...তারপর এখন কি করছ ? তোমার কাছে বহু জিনিস আমি আশা করেছিলাম, সত্য ! কিন্তু তেমন তো পাচ্ছি না ?

সত্য। সেটা আমার দুর্ভাগ্য; কিংবা হয়ত স্নেহবশে আমার শক্তি আপনি বেশী করে দেখেছিলেন।

অধ্যক্ষ। তোমার ২।১টি সামাজিক প্রবন্ধ আমি পড়েছিলাম। সুন্দর লেগেছিল। মনোহর অথচ শক্তিসম্পন্ন। তারপর বহুদিন হ'ল আর কিছু দেখছিনে।

সত্য। আপনার কাছেই শিখেছিলাম জীবনের একটা বড় tragedy এই যে, মানুষের জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার অতি অল্প অংশই পূর্ণ হয়। আমিও ভেবেছিলাম কত কি করব। কিন্তু তার অতি অল্প কিছুই আজ পর্য্যন্ত করতে পেরেছি !

অধ্যক্ষ। জীবনের এ ট্র্যাজিডি বটে; কিন্তু স্বাভাবিক ট্র্যাজিডি; সে জন্য ক্ষোভ করা অনুচিত। দুঃখের বিষয় এই যে, ট্র্যাজিডিটুকু বাদ দিয়েও যেটুকু যার হওয়া উচিত, সেটুকুও হচ্ছে না। ভবিষ্যতে বড় হবার কত লক্ষণ তোমার মধ্যে ছিল। কিন্তু কলেজ থেকে যেটুকু বড় হয়ে গিয়েছিলে, তার চেয়ে বিশেষ বড় হতে পারলে কই ?

সত্যব্রত। আপনি তো জানেন, পড়্‌বার সময় স্কলারশিপ ছাড়া আর কোন সাহায্য আমি ইচ্ছা করে নিইনি। ইচ্ছা ছিল, লেখাপড়া শেষ হলে কোন ভাল কলেজে অধ্যাপনা করব আর লেখাপড়া নিয়েই থাক্‌ব। শ্বশুরকে বল্‌তে তিনি বল্‌লেন, আমার ষ্টেটের ম্যানেজার হও, এর জন্য পারিশ্রমিক বা বেতন নিও। ইচ্ছা কর্‌লে ও বুদ্ধি থাক্‌লে, তুমি এই কাজেই কত লোকের কল্যাণ করবে। তাই করতে লাগ্‌লাম। খুব পরিশ্রম ও সাধুতার সঙ্গে, যাতে করে প্রজারা সুখ ও শান্তি পেতে পারে, প্রাণপণে সেই চেষ্টাই কর্‌তে থাকলাম! কিছুদিন বেশ ছিলাম। একদিন এরই ফলে গোলমাল বাধ্‌ল। সব ছেড়ে আমি চলে এলাম। এতদিন এক রকম অজ্ঞাতবাসে ছিলাম তাই আপনার কাছেও আস্‌তে পারিনি।...আপাততঃ এই কলেজে কি কোন অধ্যাপকের কাজ পেতে পারি?

অধ্যক্ষ। সম্প্রতি এক ইংরাজীর অধ্যাপকের পদ খালি হচ্ছে। তুমি যদি এ কাজ কর, অবশ্যই পাবে।

সত্যব্রত। আমি আবার একবার যাচ্ছি সেখানে। ফিরে এসে আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌ব।

অধ্যক্ষ। বেশ, আমি তোমার জন্য পনের দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌ব। তবে আমার শেষ কথা, যেখানেই যাও, যে পথেই থাক, চিন্তা করার ও লেখার অভ্যাস বরাবর রাখবে। মাঝে মাঝে ২।১টি ভাল জিনিষ হাত থেকে নিশ্চয়ই বেরুবে। কাজ সকলেই করে, সকলকেই করতে হবে। তার সঙ্গে ভাবতে শেখাও দরকার। যার যা চিন্তা, সে যদি দেশকে জাতিকে দিয়ে যায়,—দেশের শ্রীবৃদ্ধি হবেই হবে।

* *

*

সন্ধ্যায় ট্রেণ। এই ট্রেণে সত্যব্রত কিশোরগঞ্জ যাইবে। যাইবার ব্যবস্থা

সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। জিনিষ-পত্র বাঁধা হইয়া আছে। বিভাই সব গুছাইয়া দিয়াছে। গ্রীষ্মের দিন; নূতন কুঁজা কিনিয়া তাহা আপন হাতে সুশীতল জলে পূর্ণ করিয়া কাষ্ঠাসনে বসাইয়া রাখিয়াছে। স্বহস্তে রাত্রের জন্য খাবার তৈরী করিয়া আহার্য্যবাহী পাত্রে গুছাইয়া রাখিয়াছে। তবে সকাল হইতে সে একবারও সত্যব্রতের কাছে আসে নাই।

অপরাহ্নে সত্যব্রত নিজেই একবার বিভাকে ডাকিল। বিভা তাহার অশ্রু-জলাঙ্কিত মুখ লইয়া সঙ্কুচিত ভাবে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সত্যব্রত ধীরে ধীরে বলিল, বিভা, আমি তাহলে এখনি বেরুব।

বিভা চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু তাহার আয়ত চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

সত্যব্রত জিজ্ঞাসা করিল, বিভা, আমার জন্য কি তুমি কোন দুঃখ পেয়েছ?

বিভা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

সত্যব্রত বলিল, তবে তুমি কাঁদছ কেন?

বিভা চক্ষু মুছিয়া বলিল, আমার মনে হচ্ছে তুমি হয়ত আর আসবে না। সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষু দিয়া আবার অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল।

সত্যব্রত বিভার অশ্রুসজল দৃষ্টির পানে চাহিয়া বলিল, হয়ত আমার আর আসা হবে না, যদিও আমার বড় ইচ্ছা আমি তোমাদের মাঝেই আমার জীবন কাটিয়ে দিই।

বিভা ব্যথিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কেন আসবে না?

সত্যব্রত বলিল, আমার আসা বা না আসা তোমারই উপর নির্ভর করছে। তুমি যদি বল, তুমি যদি আমার কথা শোন, তবেই আসব। নয়ত, আসবার শত ইচ্ছা সত্বেও আমার আসা হবে না।

মুখ তুলিয়া বিভা ধীরে ধীরে বলিল, আমি তোমার কোন্ কথা শুনিনি

নিত্যদা? আর আমার উপরেই তোমার ফিরে আসা নির্ভর করছে অথচ তুমি বলছ হয়ত তোমার আসা হবে না! আমি ইচ্ছা করে বলব যে তুমি এসো না, বা এমন কিছু করব যার জন্য তোমার আসা হবে না?

সত্যব্রত বলিল, তুমি ইচ্ছা করে এমন কথন করতে পার না। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারে বা অনিচ্ছাসত্ত্বেও মানুষ অনেক কিছু করে ফেলে।

বিভা আরও কিছু শুনিবার জন্য সত্যব্রতের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

সত্যব্রত বিভার মনোভাব বুঝিয়া বলিল, কাল সন্ধ্যায় অনঙ্গমোহন বাবু এলে তুমি তাঁর সুমুখে বা'র হওনি কেন?

বিভা একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, অনঙ্গ বাবুর লজ্জাহীন প্রাণহীন কথা সব সময়ে যদি সহ্য করতে না পারি, কি করব বল? তিনি কি উদ্দেশ্যে আসেন সেটা জানার পর, তাঁকে আসতে বারণ করে দেওয়াই উচিত ছিল। আমি বাবাকে তো বলেছি, এই রকম পুতুলের মত আমি এসব লোকের সামনে বার হ'তে পারবো না।

সত্যব্রত। প্রায় বৎসর খানেক হ'ল আমি এখানে আশ্রয় পেয়েছি। তোমাকে আমি এতদিন ছোটবোনের মত, তোমার বাবাকে নিজের বাবার মত দেখেছি। আমা হতে তোমার কোন অনিষ্ট হবে এযে আমার অসহ্য বিভা!···

বিভা একটু সন্দিগ্ধভাবে বলিল, ওকথা কেন বলছ তুমি?

চিকিৎসক যেমন বেদনাপূর্ণ ক্ষতের উপর অস্ত্রোপচার করেন সেইমত সত্যব্রত হঠাৎ বলিল, যে দিন তুমি আমার এই বিছানার উপর একখানা চিঠি হাতে কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়েছিলে, অনিচ্ছায় অথচ আচম্বিতে নিষ্ঠুরের মত আমি তা প্রত্যক্ষ করেছিলাম; অথচ কোন প্রতিকার করতে পারিনি।

বিভা একথার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে যে সত্যব্রতের চোখে এমন করিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা সে কোনমতে কল্পনাও করিতে পারে নাই। বিভা নিরুত্তরে মাথা নীচু করিয়া রহিল।

সত্যব্রত একটু সরিয়া আসিয়া বিভার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, বিভা, লজ্জা পেও না। তোমার মনে যদি কোন ভাবান্তর ঘটে থাকে, তার জন্য আমিই দায়ী। তুমি জান্‌তে না যে আমি বিবাহিত। জান্‌লে তোমার নির্মল হৃদয়ে এভাব আসতেই পারত না। কিন্তু আমি এসে তোমার ক্ষতি করে গেলাম, তোমার জীবন ব্যর্থ করে গেলাম—এ চিন্তা যে তুষানলের মত আমাকে চিরদিন পুড়িয়ে মার্‌বে!—বলিয়া সত্যব্রত কাতর ও অনুতপ্ত দৃষ্টিতে বিভার পানে চাহিল।

বিভা সে দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার চম্পকাঙ্গুলির ফাঁক দিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল।

সত্যব্রত বলিল, তুমি বল বিভা, তোমার চক্ষের সাম্‌নে এসে যদি আমি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বাস করি আর তুমি যদি এই মনোভাব নিয়ে থাক, তাহ্‌লে কত যন্ত্রণা তোমার হবে বল দেখি! আর তোমাকে আমি ভালবাসি, তোমার মঙ্গল কামনা আমি সতত করি;—তোমার এ নীরব যন্ত্রণা আমি কি করে সহ্য করব? সত্যি যদি তুমি আমাকে ভালবাস, তাহলে এ-কষ্ট কি আমাকে তুমি দিতে পারবে?

বিভা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সত্যব্রত বিভার কাছে আগাইয়া আসিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিল, তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, কাজেই আমার আর ফিরে আসা হবে না বিভা!

বিভা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়া সত্যব্রতের পা'দুটি জড়াইয়া ধরিয়া তাহা অশ্রুজলে সিক্ত করিতে করিতে বলিল, তুমি ফিরে এস। আমায়

ক্ষমা কর। আর কখন আমাকে বিচলিত দেখ্‌বে না।···আমি তোমাদের সেবা করেই শান্তি পাব। এর চেয়ে আমার জীবনে আমি বড় সুখের কল্পনাও করতে চাইনে। আমি তোমাকে, তাঁকে, একটুও হিংসা কর্‌ব না। তোমাদের সুখেই সুখী হবো।

সত্যব্রত সস্নেহে বলিল, তুমি যে হিংসা করতে পার না—একি আমি জানিনে? কিন্তু আমি যে তা সহ্য করতে পারি না। তোমার সম্মুখে গৌরবময় জীবন, সে জীবন কি আমি ব্যর্থ হতে দিতে পারব? আমি ফিরে আস্‌ব, যোগ্য পাত্রে আমি তোমাকে অর্পণ কর্‌ব। অথচ তোমার-আমার ভালবাসা একটুও কম্‌বে না।

বিভার চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। মুখে সে কিছুই বলিল না। সত্যব্রত বলিল, এর কতখানি যৌবনের স্বপ্ন, তা তুমিও জান না, আমিও জানি না। আজ যাকে অন্যভাবে ভাব্‌তে বল্‌লে তোমার ব্যথা লাগছে, তা কালে সহ্য হয়ে যেতেও পারে এবং আমি বিশ্বাস করি তা পার্‌বে। সকল ভালবাসাই তো মূলে এক। সকল সম্বন্ধই ভালবাসার এক-এক রূপ, তোমার মনে যে ভালবাসার রূপ জেগেছে, তাকে একটু বদ্‌লানো কি তোমার এতই কঠিন হবে বিভা? তুমি বিবাহে রাজি হবে, আমাকে অন্যভাবে গ্রহণ কর্‌বে, একথা তুমি বললে আমি আস্‌ব। নইলে এই আমাদের শেষ-দেখা, বিভা!

বিভার কান্না তবুও থামিল না। সত্যব্রত ধীরস্বরে বলিল, আমি এখনি তোমার উত্তর চাইছি না। তুমি ভাব, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, তারপর আমাকে একখানা চিঠি দিয়ে জানিও। আমি আসব। তোমাকে যোগ্য পাত্রে দেব। তোমায় সুখী করব।

বিভা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তুমি আমার চেয়ে শক্তিমান্‌, নিত্যদা। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। আমি চেষ্টা কর্‌ব। তোমাকে জানাব;

কিন্তু তুমি আমাকে এমনি করে ফেলে যেও না। যদি সম্ভব হয়, আমি তোমার কথা রাখব। কিন্তু তুমি এস, এস নিত্যদা।

"তাহলে আমি এবার যাই বিভা! জিনিষ-পত্র সব চলে গেছে, আর দেরী করবার উপায় নেই।" বলিয়া সত্যব্রত গমনোদ্যত হইল।

বিভা উঠিয়া গলবস্ত্র হইয়া নিত্যধনকে প্রণাম করিল।

"তুমি সুখিনী হও, তোমার সব দুঃখ-ব্যথা দূরে যাক্‌" বলিতে বলিতে সত্যব্রত ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। বাহিরে আর কাহারো সমক্ষে যাইতে বিভার সাহস হইল না। যতক্ষণ দেখা যায়, সেখান হইতে সত্যব্রতকে সে দেখিল। সত্যব্রতের পদশব্দ শুনিল। সত্যব্রতকে লইয়া গাড়ী চলিয়া গেল—সে শব্দও লক্ষ্য করিল। তারপর সেই শূন্য কক্ষতলে সে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

২২

সারদাশঙ্কর কাছারী-বাটীর এক পৃথক্‌ কক্ষে বসিয়া ছিলেন। সঙ্গে দেওয়ান। একজন যুবক কর্ম্মচারী ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া সংবাদ দিল—জামাইবাবু এসে পৌঁছেছেন। এখন দারোয়ান যদি তাঁকে আটকায়?

সারদাশঙ্করের মুখে ভ্রূকুটি ফুটিয়া উঠিল। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, সে যেমন নীচ কাজ করেছে, এই নীচ ব্যবহারই তার পাওয়া উচিত।

দেওয়ান নীরবে ছিলেন, এতক্ষণে বিনীতভাবে বলিলেন, এটা কেবল বিজয়ের শোনা কথা। সত্য হতে পারে, মিথ্যাও হতে পারে। সে কথার উপর নির্ভর করে অতখানি অপমান করা অতি অন্যায় হবে। আপনার বংশের উপযুক্ত কাজ হবে না।

সারদাশঙ্কর বলিলেন, বিজয়ের উপর আপনার শ্রদ্ধা না থাকতে পারে। কিন্তু সে যে মিথ্যাবাদী একথা মনে করবার আপনার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

দেওয়ান বলিলেন, আমি বিজয়কে মিথ্যাবাদী বল্‌ছিনে, কিন্তু ভুল যেমন সবারি হয়, তেমনি তারও হতে পারে। কিন্তু এখন বাদানুবাদের সময় নেই। আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাঁকে পৃথক্ স্থানে সম্বর্দ্ধনা করে আপাততঃ বসাই।

সারদাশঙ্কর বলিলেন, আমি সে অনুমতি দিতে অক্ষম। আপনার সম্বর্দ্ধনা আর আমার সম্বর্দ্ধনায় বিশেষ কোন তফাৎ নেই।

দেওয়ান হতাশ হইয়া বলিলেন, তবে আমায় পদচ্যুত করুন, নয় আমায় পদত্যাগ করবার অনুমতি দিন। আমি যেটুকু পারি সুব্যবস্থা করতে চল্‌লাম।

দেওয়ান আর অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই ছুটিতে ছুটিতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার সব চেয়ে বেশী ভয়, পাছে দারোয়ান সারদাশঙ্করের নির্দ্দেশমত সত্যব্রতকে অপমান করিয়া বসে!

ফটকের সম্মুখে দেওয়ান অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইতেই সত্যব্রত ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। দেওয়ান আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কতক্ষণ এসেছ, বাবা?

"এই একটু আগে বলিয়া" সত্যব্রত উঠিয়া দাঁড়াইল। দেওয়ানজী আসিতেই উপস্থিত অন্যান্য সকলে দূরে সরিয়া গিয়াছিল।

দেওয়ানজী বলিলেন, এমন অজ্ঞাতবাস করেছিলে, বাবা, যে

কিছুতে খুঁজে বার করতে পারলাম না! একটা খবরও তো দিতে হয়, বাবা! আর বুড়ো জ্যাঠাকে তো একেবারে ভুলেই গেছলে!

সত্যব্রত লজ্জিত হইয়া বলিল, কলকাতাতেই ছিলাম। ভেবেছিলাম একটা চাকরি-বাকরির ব্যবস্থা করে তবে এদের সবাইকে নিয়ে যাব। খবর তো একবার দিয়েওছিলাম—

সহসা দেওয়ানজী আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সত্যই রাগের বশে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেছ?

সত্যব্রত বিস্মিত হইয়া বলিল, আজ্ঞে না; কিন্তু কে বল্লে এ কথা?

দেওয়ানজী। বিজয় কলকাতায় তোমার খোঁজ করতে যান; ফিরে এসে এই খবর দেন।

সত্যব্রত বলিল, আমাকে একবার অন্ততঃ জিজ্ঞাসা করলে তো পারতেন। খুন ক'রে যে ধরা পড়ে, তাকেও জজ একবার জিজ্ঞাসা করে সে সত্যি সত্যি খুন করেছে কি না।

দেওয়ানজী বলিলেন, সে সব কথা এখন ছেড়ে দাও, বাবা। এখন এসেছ তুমি, সব মিটে যাবে। চলো, কর্তার সঙ্গে দেখা করবে। আমিও যাচ্ছি।

দেওয়ানজী ও সত্যব্রত দেউড়ী পার হইয়া কাছারী বাড়ী উপস্থিত হইলেন।

সত্যব্রত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সারদাশঙ্করকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল।

সারদাশঙ্কর 'দীর্ঘজীবী হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, ব'স। ভাল আছ?

সত্যব্রত দাঁড়াইয়া থাকিয়াই বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তারপর দু'জনেই কিছুকাল স্তব্ধ।···কিছুপরে সত্যব্রত বলিল, আমার কর্ত্তব্য, তাই আপনার নিষেধ সত্ত্বেও আবার এদের নিয়ে যেতে চাই।

সারদাশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন, এরা যেতে চাইবে আমার অমতে ?

সত্যব্রত বলিল, আমার বিশ্বাস যেতে চাইবে। না চায় আমি যেমন এসেছি তেমনি চলে যাব।

সারদাশঙ্কর উঠিয়া বলিলেন, বেশ ; উমা যেতে চায় আমার অমতে, যেতে পারে।

সত্যব্রত বলিল, কাউকে দিয়ে একটা খবর পাঠিয়ে দিলে হয়। আমি ততক্ষণ বাইরে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। যদি আপনার কন্যা যেতে চায় আমি নিয়ে যাব, নইলে একাই ফিরে যাব।

বলিয়া যেমন ধীর পাদক্ষেপে আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

ভিতরে আর সারদাশঙ্করকে সংবাদ দিতে হইল না। সত্যব্রত বাহিরে পৌঁছিতেই উমা খোকাকে কোলে লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। সারদাশঙ্কর সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, একি উমা, তুমি এখানে কেন ?

উমা গলবস্ত্রা হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, বাবা, আমায় অনুমতি দিন. আমি স্বামীর সঙ্গে যাব বলে বেরিয়েছি।

সারদাশঙ্করের দৃষ্টি কঠিন হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন, আমার অমতে?

উমা ধীরস্বরে বলিল, বাবা, আপনি, ঠাকুমা, মা সবাই শিখিয়েছেন সুখে-দুঃখে স্বামীকে অনুসরণ করবে। আমায় আশীর্বাদ করুন, আমি যেন আপনাদের শিক্ষামতে চলতে পারি।...অনুমতি দিন্ বাবা, স্বামীর সঙ্গে যাবই আমি।

সারদাশঙ্কর রুক্ষ স্বরে বলিলেন, ঐ স্বামীর সঙ্গে ?

উমা দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, বাবা, উনি নির্দোষ।

সারদাশঙ্কর সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া বলিলেন, আর আমি যদি অনুমতি না দিই ?

উমা বলিল, আমার যে আর দ্বিতীয় স্থান নেই বাবা···আমায় ক্ষমা করবেন···আমি চল্লাম।

বলিয়া উমা প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। দেখাদেখি খোকাও প্রণাম করিল। উমা পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইল। সারদাশঙ্কর স্থাণুর মত বসিয়া রহিলেন। উমা ধীরে ধীরে পিতৃপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া মুক্ত প্রান্তরের উপর স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সকলেরই মনে পড়িল, যে উমা বালিকাবয়সে স্বয়ম্বরা হইয়াছিল, সে আজ যৌবনে স্বামীকে ছাড়িয়া থাকিবে কেন?

কিছুক্ষণ পরে যখন স্ত্রী-পুত্র লইয়া সত্যব্রত গাড়ীতে উঠিতে যাইবে, দেওয়ান সমভিব্যাহারে সারদাশঙ্কর সেখানে আসিয়া তাহাদের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। জামাতার হাত ধরিয়া সারদাশঙ্কর বলিলেন, বাবা, দেওয়ানজীর মুখে আমি সব শুনেছি। আমার ভুল হ'য়েছিল। আমার অন্যায় হ'য়েছিল। আমার দুর্ব্যবহার ভুলে যাও। এস বাবা, উমা, ফিরে আয় মা!

উভয় চাহিয়া দেখিল - সারদাশঙ্করের চক্ষে জল!!

* *

*

দীর্ঘ এক বৎসর পরে জমিদার-ভবনে আনন্দের স্রোত বহিল। কলিকাতায় কোথায় কি ভাবে সত্যব্রত ছিল, তাহা দেওয়ানজীর অনুরোধে বলিতে হইল।

খোকা কিছুক্ষণের জন্য যেন অচেনার মত রহিল। তারপর ছায়ার মত পিতার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে লাগিল।

বিজয় আসিয়া বলিল, আমিই শিব গড়তে বাঁদর গড়েছিলাম

আমারই দোষে এতদূর গড়িয়েছিল। বলিয়া কেমন করিয়া সে উক্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিল তাহাও উল্লেখ করিল।

অভিমানের অনেক কথাই উমার মনে জমা হইয়াছিল। বহু রাত্রি পরে যখন সে আপন কক্ষে স্বামীকে ফিরিয়া পাইল তখন সকল অভিমান অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল। স্বামীর বাহুর বাঁধনে বহুক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া তবে উমা শান্ত হইল।

তাহার অশ্রুজলের মধ্যেও তৃপ্তি ও প্রসন্নতার হাস্য ফুটিয়া উঠিল। সত্যব্রত কথায় কথায় বলিল, তুমি যদি চিঠিতে আসতে নিষেধ না করতে, তাহলে প্রথম বারেই আমি এসে পৌঁছুতাম।

উমা লজ্জা পাইয়া বলিল, বাবা যদি রাগের বশে তোমাকে কোন অপমানের কথা বলেন, সেই ভয়ে আমি ঐ চিঠি লিখেছিলাম।

সত্যব্রত জিজ্ঞাসা করিল, তবে পরে আবার অমন চিঠি কেন লিখ্‌লে?

উমা বলিল, তা বুঝি তুমি জাননা? দাঁড়াও দেখাচ্ছি। বলিয়া উমা উঠিয়া আপনার বাক্স খুলিয়া একখানি সুদৃশ্য খামশুদ্ধ চিঠি আনিয়া স্বামীর হাতে হাত দিয়া বলিল, পড়।

কৌতূহলভরে চিঠিখানি বাহির করিয়া সত্যব্রত পড়িতে লাগিল।

শ্রীচরণেষু,

দিদি! তুমি আমাকে জাননা, কিন্তু আমি তোমাকে জানি। সেইজন্য আজ এই পত্র তোমাকে লিখিতেছি। তোমার স্বামী তোমাকে আনিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। আনিবার সব ঠিকও হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ তোমাদের কাছ হইতে দুইখানি পত্র আসিয়া সব গোলমাল করিয়া দিল। পত্র দুইখানি তাঁহার অন্তরে বড়ই আঘাত

দিয়াছে। সব চেয়ে বেশী কষ্ট হইয়াছে তোমার পত্র পাইয়া। তোমার ঐরূপ পত্র যদি না আসিত, তাহা হইলে নিষেধ সত্ত্বেও তিনি তোমাকে আনিতে যাইতেন। তোমার সেই নিষেধ করার চিঠিখানি তিনি যে কতবার পড়িয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। কালও সেই চিঠি পড়িতে পড়িতে তাঁহার চোখে জল আসিয়াছিল। ইহা দেখিয়া আমি তোমাকে এই চিঠি দিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। তোমার স্বামী কি করিয়া এখানে আসিলেন ও কি ভাবে এখানে আছেন, তাহা তোমার অবগতি ও বিশ্বাসের জন্য বলা প্রয়োজন। তাহাই বলিতেছি।

তিনি একটি সামান্য কার্য্য গ্রহণ করিয়া এখানে আসেন। সে কার্য্য পাচকের। কিন্তু এ কার্য্যের মধ্যেও তিনি এমন কর্ত্তব্যজ্ঞান ও শক্তির পরিচয় দেন যে, আমার পিতৃদেব তাঁহাকে উচ্চপদে নিয়োগ করিয়াছেন। এখানে তিনি নিত্যধন নামে আপনার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে 'নিত্যদাদা' বলিয়া ডাকি এবং আমাদের সংসারেরই একজন বলিয়া মনে করি। নিত্যদা'র উপর তোমাদের সন্দেহ হইয়াছে, কেহ হয়ত তাঁহার সম্বন্ধে কোন মিথ্যা কুৎসা রটনা করিয়াছে। তিনি নিষ্কলঙ্ক, নির্ম্মল চরিত্র। কোন মন্দ তাঁহাকে আজ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই, আর পারিবেও না। তাঁহার মঙ্গলের জন্য এবং তোমারও মঙ্গলের জন্য এখনি তাঁহাকে ভাল করিয়া পত্র দিবে ও তোমাকে লইয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিবে। তাহা হইলে তাঁহার দুঃখ কমিবে। তোমার স্বামি-সৌভাগ্য অসীম। তিনি দেবচরিত্র। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন সন্দেহ কোন মতে পোষণ করিবে না। শীঘ্র তাঁহাকে এমন করিয়া পত্র দিবে, যাহাতে তাঁহার মনের গভীর দুঃখের হ্রাস হয়। ইতি—কনিষ্ঠা ভগ্নী বিভা।

চিঠিখানি পড়িয়া সত্যব্রত ক্ষণকাল উন্মনা হইয়া রহিল। তাহার দুঃখ দেখিয়া বিভাই তবে এ ব্যবস্থা করিয়াছিল।

বিভার এই মূর্ত্তি তাহার চক্ষে বিভাকে আরো মহিমান্বিত করিয়া তুলিল।

* *

*

ঠিক সেই সময়ে আপনার নির্ব্বাণ-দীপ রুদ্ধকক্ষে বাতায়নের কাছে বসিয়া বিভা সজল নয়নে সত্যব্রতের কথা চিন্তা করিয়া বিনিদ্র রজনী কাটাইতেছিল।

সারা আকাশ তখন অগণিত তারকার চক্ষু মেলিয়া সৌধকিরীটিনী কলিকাতা নগরীর পানে চাহিয়া প্রভাতের অপেক্ষা করিতেছে। ধীরে ধীরে আকাশের প্রসন্ন ললাটে শুকতারা দীপ্ত তিলকের মত ফুটিয়া উঠিল। অস্ফুট বিহগের কণ্ঠে উষার আগমনী ধ্বনিত হইল। বিভা সেই কঠিন শীতল হর্ম্ম্যতলে লুটাইয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে বলিতেছিল—তোমার চিন্তা ছাড়িয়া আর কাহারও চিন্তা আমি করিতে পারিব না। তোমায় অন্যভাবে ভাবা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি তোমাকে কোনদিন চাহিব না। তোমার স্মৃতি বুকে করিয়া আমি আমরণ পড়িয়া রহিব। তাহাতেই আমার শান্তি, তাহাতেই আমার সুখ মিলিবে। এ-জীবনে, পর-জীবনে, জন্মজন্মান্তরে তোমার চিন্তা আমি ত্যাগ করিতে পারিব না। আমায় তুমি ক্ষমা করিও।

অশ্রুজলে পাষাণ ভিজিয়া গেল। উষার প্রথম গন্ধভরা বাতাস স্নিগ্ধ আলোকের রেখা বহিয়া বিভার তপ্ত ললাটে তাহার কোমল শীতল হস্ত বুল বুলাইতে লাগিল। অশ্রুজলে পাষাণ ভিজিয়া গেল, তবু গলিল না।

—শেষ—